Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল সাহরিন

রোলঃ 23100120739

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল সাহরিন

রোলঃ 23100120739

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল সাহরিন, আইডিঃ 23100120739 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Jannat

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

জান্নাতুল সাহরিন

আইডিঃ 23100120739

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

🎓 ভূমিকা (Introduction) 8

|| প্রথম অধ্যায় || 13

প্রাচীন সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান: 13

পাঠ ১.১: "পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী" 13

পাঠ ১.২: "মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও নারী নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" 15

পাঠ ১.৩ "প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা" 16

পাঠ ১.৪ : "প্রাচীন রোমান সভ্যতা: কঠোর আইন ও দাসত্ব" 17

পাঠ-১.৫ "ভারতীয় ও হিন্দু সভ্যতায় নারী : 18

পাঠ ১.৬: "বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি" 20

পাঠ ১.৭ "প্রাচীন পারস্য ও চীন সভ্যতা" 21

পাঠ :১.৮ "জাহিলিয়াতের যুগে নারী ও কন্যা সন্তান হত্যা" 22

পাঠ ১.৯ "অন্ধকার যুগে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা" 25

||২য় অধ্যায়|| 27

"নারীবাদের উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রকারভেদ" 28

পাঠ ২.১: নারীবাদের সংজ্ঞা, দার্শনিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক পটভূমি 28

পাঠ ২.২: "নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ (First Wave: ১৮৪৮-১৯২০)" 32

পাঠ ২.৩ নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ (Second Wave: ১৯৬০-১৯৮০) 37

পাঠ ২.৪: নারীবাদের তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গ (উত্তর-আধুনিকতা ও ডিজিটাল নারীবাদ) 41

পাঠ ২.৫: নারীবাদের বিভিন্ন শাখা ও মতাদর্শিক বৈচিত্র্য (*Schools of Thought)* 46

পাঠ ২.৬: মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের অনুপ্রবেশ ও 'ইসলামী নারীবাদের' তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 50

পাঠ ২.৭: "নারীবাদের অসারতা: সামগ্রিক পর্যালোচনা" 54

|| ৩য় অধ্যায় || 57

"ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক, মানবিক ও পারিবারিক অধিকার" 57

পাঠ ৩.১: ইসলামের আলোকে নারী-পুরুষের সমতা ও পরিপূরকতা 57

পাঠ ৩.২: “পুরস্কার, শাস্তি ও পরকালীন জবাবদিহিতায় সমতা” 71

পাঠ ৩.৩: “কন্যাসন্তান হিসেবে নারীর মর্যাদা” 80

পাঠ ৩.৪: “মাতা হিসেবে নারীর সর্বোচ্চ সম্মান” 83

পাঠ ৩.৫: “দাম্পত্য জীবনে নারীর অধিকার: বিয়ে, মোহরানা ও খোরপোশ প্রসঙ্গ”.........89

পাঠ ৩.৬: “পারিবারিক নেতৃত্বে ভারসাম্য: তালাক এবং ইদ্দত” 94

পাঠ ৩.৮: “বোন ও অন্যান্য নারী আত্মীয়দের অধিকার: আত্মীয়তার বন্ধন ও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি” 103

||চতুর্থ অধ্যায়||..106

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক অধিকার.......................................106

পাঠ ৪.১: “সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা ও আর্থিক স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ও শারঈ পটভূমি” 106

পাঠ ৪.২: “মিরাস বা উত্তরাধিকার আইনের যৌক্তিক বিশ্লেষণ: নারীর প্রাপ্য ও ইনসাফ” 108

পাঠ ৪.৩: “জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষার অধিকার”..110

পাঠ ৪.৪: “কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ: শারঈ শর্তাবলী, শালীনতা রক্ষা ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা” 112

পাঠ ৪.৫: “সমাজ বিনির্মাণ ও দাওয়াতি কাজে নারীর ভূমিকা: কাজের আদেশ ও সামাজিক খিদমত” 115

পাঠ ৪.৬: “রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে নারীর পরামর্শের গুরুত্ব: উম্মে সালামা (রা.) ও ইসলামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা” 117

পাঠ ৪.৭: “নারী শ্রমের মর্যাদা: কারুশিল্প ও উপার্জনে মুসলিম নারীদের দৃষ্টান্ত” 119

||৫ম অধ্যায়|| 122

“নারীবাদের নেতিবাচক প্রভাব বনাম কুরআনিক সমাধান”..123

পাঠ ৫.১: “পারিবারিক কাঠামোর ধ্বংসস্তূপ: ডিভোর্স ও পরিবার ভাঙ্গনের ভয়াবহতা”...123

পাঠ ৫.২: “লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও নারীর নিরাপত্তাহীনতা: ধর্ষণ ও গার্হস্থ্য নির্যাতনের আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান” 126

পাঠ ৫.৩: “পাশ্চাত্য মডেল এবং নারীর দ্বিমুখী শোষণ: ক্যারিয়ারের নামে প্রতারণা ও পুঁজিবাদী দাসত্ব” 134

পাঠ ৫.৪: “লিঙ্গীয় সংঘাত : নারী ও পুরুষকে প্রতিপক্ষ বানানোর সামাজিক কুফল”..... 142

পাঠ ৫.৫: “নারীর নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক ট্রমা ও ডিপ্রেশনের করাল গ্রাস” 146

পাঠ ৫.৬: “নারীর নিঃসঙ্গতা ও ওল্ড হোম সংস্কৃতি: নারীবাদের তথাকথিত 'মুক্তির' চূড়ান্ত পরিণতি” 151

পাঠ ৫.৭: “আধুনিক মিডিয়ায় নারীর অশ্লীল প্রদর্শন ও নৈতিক অবক্ষয়: 'হায়া'র গুরুত্বের বিপরীত মেরু” 156

||৬ষ্ঠ অধ্যায়|| 161

“আধুনিক সংশয় নিরসন ও ইসলাম বনাম নারীবাদের আদর্শিক সংঘাত” 161

পাঠ ৬.১: “হিজাব ও পর্দা: নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বনাম আধ্যাত্মিক সুরক্ষা ও সম্মান” 161

পাঠ ৬.২: “বহুবিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আধুনিক অভিযোগের বাস্তবসম্মত জবাব”...... 164

পাঠ ৬.৩: “সাক্ষী ও উত্তরাধিকার নিয়ে নারীবাদের সমালোচনার শারঈ ও যুক্তিনির্ভর খণ্ডন” 169

পাঠ ৬.৪: 'ইসলামী নারীবাদ' : একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ ও ঈমানী সংকট 172

পাঠ ৬.৫: “নারীবাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা বনাম ইসলামি বন্দেগী: সুখ ও শান্তির মাপকাঠি” 176

পাঠ ৬.৬: “ইসলামোফোবিয়া ও নারী অধিকার: মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা এনজিও-র রাজনৈতিক এজেন্ডা” 179

||সপ্তম অধ্যায়| 184

“উপসংহার, প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা” 184

পাঠ ৭.১ “গবেষণার মূল নির্যাস ও প্রাপ্ত ফলাফল” 184

পাঠ- ৭.২ : “বর্তমান নারীবাদ সংকটে ইসলাম একমাত্র সমাধান” 186

পাঠ ৭.৩: “সুপারিশ: মুসলিম সমাজ, রাষ্ট্র এবং নারী সমাজকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা”...189

🎓ভূমিকা (Introduction)

■ গবেষণার পটভূমি *(Background of the Research):*

সৃষ্টিজগতের সেরা জীব হিসেবে মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নটি চিরন্তন। বিশেষ করে মানবজাতির অর্ধাংশ নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বিশ্বজুড়ে যুগে যুগে নানা মতবাদ ও দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।
বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থান নিয়ে যে দুটি মতাদর্শ সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে, তা হলো—'ইসলামে নারীর অধিকার' এবং আধুনিক 'নারীবাদ' (Feminism)। আপাতদৃষ্টিতে উভয় মতবাদই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিদার হলেও, এদের উৎসগত ভিত্তি, চিন্তাদর্শ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে এক বিশাল মৌলিক ও তাত্ত্বিক ব্যবধান রয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও ঐশী জীবনব্যবস্থা , যা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর অমোঘ বিধানের মাধ্যমে নারীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ নয়, বরং পারস্পরিক পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিপরীতপক্ষে, আধুনিক নারীবাদ হলো একটি মানবসৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আন্দোলন, যার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মূলত পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ এবং পুরুষতান্ত্রিক শোষণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি চরম অবমাননার অবসান ঘটাতে গিয়ে নারীবাদ ক্রমান্বয়ে পরিবার প্রথা, লিঙ্গভেদ এবং ধর্মীয় অনুশাসনের সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা সেক্যুলার নারীবাদের প্রভাবে মুসলিম সমাজেও এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে একদল লোক ইসলামে নারীর অধিকারকে আধুনিক নারীবাদের নিক্তিতে পরিমাপ করার চেষ্টা করছেন, যা ইসলামের মৌলিক আকিদা ও শরী'আহর উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে চৌদ্দশ বছর আগেই নারীর যে সম্মান ও ইনসাফভিত্তিক অধিকার নিশ্চিত করেছে, তা মানব ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব বিপ্লব।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর বান্দা এবং তাদের মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া (ধর্মভীরুতা), লিঙ্গ নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।"

—(সূরা আল হুজরাত ৪৯:১৩)

এছাড়াও আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَا لِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"তোমরা তা কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। পুরুষেরা তাদের কৃতকার্যের অংশ পাবে, নারীরাও তাদের কৃতকর্মের অংশ পাবে এবং তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

— (সূরা আন-নিসা ৪:৩২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব (আশরাফুল মাখলুকাত) হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা দিয়েছেন।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, এবং জলে ও স্থলে তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

—(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৭০)

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়েরই নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদা রয়েছে, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের ভিত্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের সম্মান ও সদ্ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রকৃত সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"

—(তিরমিযী ১১৬২, আবূ দাঊদ ৪৬৮২, আহমাদ ৭৪০২)

এই শিক্ষাগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীকে সম্মান ও সুরক্ষার সাথে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার প্রদান করে।

এই সম্মানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু আধুনিক যুগে 'নারীবাদ' বা 'ফেমিনিজম' নামক এক পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে, যা নারী অধিকারের নামে এক নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করেছে। এই মতবাদ একদিকে যেমন নারীর কিছু মানবিক দাবির কথা বলে, অন্যদিকে তা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও পারিবারিক কাঠামোর সাথে সংঘাত তৈরি করে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার এবং নারীবাদের দাবিগুলোর মাঝে এক বিশাল আদর্শিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচন এবং সত্যনিষ্ঠ সমাধান খুঁজে বের করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

■ গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা (Significance of the Research):

বর্তমান মুসলিম সমাজে একদিকে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য সেক্যুলার শিক্ষার প্রভাবে নারী অধিকার নিয়ে এক ধরণের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আধুনিক সাহিত্যের বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে নারীবাদের প্রচার-প্রসার। ফলে মুসলিম তরুণ প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রে ইসলামকে নারীর জন্য 'সংকীর্ণ' মনে করতে শুরু করেছে।

এ গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম কারনঃ-

- ১. এটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর প্রকৃত মর্যাদা এবং অধিকার তুলে ধরবে।

- ২. নারীবাদের নেতিবাচক দিক এবং এর পেছনের প্রোপাগান্ডাগুলোকে তথ্য-উপাত্তসহ বিশ্লেষণ করবে।
- ৩. আধুনিক সভ্যতায় নারী যে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই রূঢ় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলবে।
- ৪. ইসলাম ও নারীবাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যগুলো ইনসাফের সাথে স্পষ্ট করবে।

■ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives):

এই থিসিসের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দলীলভিত্তিক বর্ণনা প্রদান।
- নারীবাদের মূল ধারণা, দাবিসমূহ ,বিবর্তন ও এর লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা।
- পাশ্চাত্য নারী সমাজ এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নারী অধিকার পরিস্থিতির তুলনামূলক পর্যালোচনা।
- নারী অধিকার নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তোলা বিভিন্ন অভিযোগ ও সংশয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব প্রদান।

■ গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions)

১.ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকার কী কী?

২.নারীবাদের মূল দর্শন কী?

৩.ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

৪.কোন পদ্ধতি অধিক টেকসই ও কল্যাণকর?

৫.আধুনিক সমাজে এই দুই ব্যবস্থার বাস্তব প্রভাব কী?

■ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

এই থিসিসটি মূলত একটি বর্ণনামূলক ও তাত্ত্বিক (Descriptive and Theoretical) গবেষণা। এতে 'গুণগত পদ্ধতি' (Qualitative Method) অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে:

ক. প্রাথমিক উৎস:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, কুরআনের তাফসির (তাফসীরে ইবনে কাসির এবং তাওযীহুল কুরআন)

সিহাহ সিত্তাহসহ নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং ইমাম ও মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা।

খ. মাধ্যমিক উৎস:

সমকালীন বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও গবেষকদের রচিত কয়েকটি বিশেষায়িত গ্রন্থ, যা ইসলাম ও নারীবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে।

- পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম - জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী।
- বিহাইন্ড ফেমিনিজম , নারীবাদের বাস্তবতা - মারিয়াম তানহা।
- কথিত নারীবাদের ইতিহাস, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা - বব লুইস ; ভাষান্তর - ফারিহা মায়মুনা।
- নারী ও বাস্তবতা - শাহ আবদুল হান্নান।
- ইসলামে নারীর মূল্যায়ন - মুফতী হিফজুল রহমান।
- ইসলামে নারী - আল বাহি আল খাওলী।
- ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী - ডঃ মুস্তাফা আস্ সিবায়ী।
- সিরাতে ইবনে হিশাম/ সিরাতে মুস্তাফা

গ. সবশেষ উৎস :

এছাড়া সমসাময়িক জার্নাল, নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

■ উপসংহারমূলক বক্তব্য:

ইসলাম নারীকে কেবল 'অধিকার' দেয়নি বরং তাকে দিয়েছে ‘সম্মান’ এবং 'মর্যাদা'। পক্ষান্তরে নারীবাদ অনেক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। এই থিসিসটি অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে, কেবল ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই নারীর প্রকৃত মুক্তি ও অধিকার রক্ষা করা সম্ভব।

|| প্রথম অধ্যায় ||

প্রাচীন সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান:

মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভ্যতায় নানাভাবে নারী সমাজ ছিল অধিকারবঞ্চিত ও নিগৃহীত। ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময় তাকে অশুভ বস্তু বা শয়তানের চক্রান্ত হিসেবে গণ্য করা হতো। আধুনিক নারীবাদ যে অধিকারের কথা বলে, তার কয়েক শতাব্দী আগেই ইসলাম নারীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিল।

এই অধ্যায়ে আমরা ইতিহাসের আলোকে নারী নির্যাতনের চিত্র (পাশ্চাত্য সভ্যতা, প্রাচীন গ্রিক, রোমান, ভারতীয়, পারস্য এবং জাহিলী আরবের প্রেক্ষাপটে) নারীর সামাজিক ও আইনি অবস্থান বিশ্লেষণ করব এবং ইসলামের আগমনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করব।

পাঠ ১.১: "পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী"

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগপাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে মূলত ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে বোঝায়। এই সভ্যতায় নারীর ইতিহাস মূলত চরম লাঞ্ছনা থেকে শুরু করে উগ্র স্বাধীনতার নামে পণ্য হওয়ার ইতিহাস। একে আমরা তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি:

১. রেনেসাঁ পূর্ববর্তী কাল (মধ্যযুগীয় অন্ধকার):

মধ্যযুগীয় ইউরোপে নারী ছিল কেবল পাপের উৎস। গ্রিক ও রোমান আইনের প্রভাব এবং চার্চের কঠোরতার কারণে নারী ছিল আইনিভাবে মৃত। বিখ্যাত দার্শনিক থমাস একুইনাস (*Thomas Aquinas*) নারীকে "উৎপাদন ত্রুটি" (*Defective and Misbegotten)* হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই সময়ে নারী ছিল কেবল ঘরের আসবাবপত্রের মতো ।

২. শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক যুগের সূচনা (শ্রম ও শোষণ): ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়, তখন নারীর অবস্থা দাসত্ব থেকে শোষণে রূপান্তরিত হয়।

শ্রমিক হিসেবে অবমাননা:
কল-কারখানায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হতো, কিন্তু তাদের মজুরি দেওয়া হতো পুরুষের অর্ধেক বা তারও কম।
পারিবারিক কাঠামো ভাঙন:
শিল্পায়নের ফলে নারীরা ঘর থেকে বাইরে আসতে শুরু করলে ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। শিশু লালন-পালন ও নৈতিক শিক্ষার স্থান দখল করে নেয় কল-কারখানার ব্যস্ততা।

৩. বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নারীর পণ্যকরণ (*Commodification of Women*):
জাস্টিস তকী উসমানী তার 'পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম' গ্রন্থে বর্তমান পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থাকে "চটকদার বিজ্ঞাপনের আড়ালে চরম লাঞ্ছনা" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
অর্থনৈতিক হাতিয়ার:
পুঁজিবাদী বিশ্ব নারীকে আজ পণ্যের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে ব্যবহার করছে। শেভিং ক্রিম থেকে শুরু করে গাড়ি—সবকিছুর কাটতি বাড়াতে নারীর দেহকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এটি মূলত নারীর মর্যাদার এক চরম অবক্ষয়।
উগ্র স্বাধীনতা ও একাকীত্ব:
পাশ্চাত্যে নারীকে তথাকথিত যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তার ফলে আজ সেখানে পারিবারিক বন্ধন বিলুপ্তপ্রায়। বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ পাশ্চাত্য নারী ওল্ড হোমে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান, যা ইসলামের পারিবারিক নিরাপত্তার ঠিক উল্টো চিত্র।
বিহাইন্ড ফেমিনিজম:
আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ দাবি করে তারা নারীকে অধিকার দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তারা নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মক্ষেত্রে সস্তা শ্রমিকে পরিণত করেছে এবং ঘরের শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

রেফারেন্স:
১. পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম, জাস্টিস তকী উসমানী।
২. বিহাইন্ড ফেমিনিজম, মরিয়ম তানহা।

পাঠ ১.২: "মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও নারী নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"

মধ্যযুগীয় ইউরোপে (যাকে ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' বা *Dark Ages* বলা হয়) নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ ও অমানবিক। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারী অধিকারের দাবি করলেও, তাদের ইতিহাস ছিল নারী বিদ্বেষে ভরপুর।

১. ডাইনি শিকার *(Witch-Hunting):*

মধ্যযুগে ইউরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে 'ডাইনি শিকার' নামক এক ভয়াবহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনো নারী যদি একটু বুদ্ধিমতী হতো বা ভেষজ চিকিৎসা জানত, তবে তাকে শয়তানের অনুসারী বা 'ডাইনি' সাব্যস্ত করা হতো। হাজার হাজার নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে বা পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে।

২. আইনি ও সামাজিক দাসত্ব (*Coverture):*

ইউরোপীয় আইনে 'কভারচার' *(Coverture)* নামক একটি প্রথা ছিল। এই আইন অনুযায়ী, বিয়ের পর নারীর কোনো স্বাধীন আইনি অস্তিত্ব থাকত না। তার সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর দখলে চলে যেত। এমনকি নারী কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারত না বা নিজের উপার্জিত অর্থের মালিক হতে পারত না। স্বামী তার স্ত্রীকে দৈহিক শাস্তি দেওয়ার আইনি অধিকার রাখত।

৩. চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর আত্মা বিষয়ক বিতর্ক:

মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদগণ নারীকে 'শয়তানের প্রবেশদ্বার' হিসেবে দেখতেন। ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের 'কাউন্সিল অফ মাকন' *(Council of Mâcon)* নামক একটি বড় ধর্মীয় সম্মেলনে বিশপরা এই বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন যে— "নারীর কি আদৌ কোনো আত্মা আছে? নাকি তারা কেবল পশুর মতো?" দীর্ঘ বিতর্কের পর তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, নারীর আত্মা আছে তবে তা পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের এবং সে কেবল পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্ট।

৪. সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা:

তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে উত্তরাধিকার আইনে নারীর কোনো স্থান ছিল না। পরিবারের বড় ছেলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতো, আর নারীরা দয়া বা করুণার পাত্রী হয়ে থাকত। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতাই পরবর্তীকালে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫. শিল্প বিপ্লব ও শ্রম শোষণ:

শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিকে ইউরোপে নারীদের কলকারখানায় অত্যন্ত অমানবিক পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য করা হতো, কিন্তু তাদের মজুরি দেওয়া হতো পুরুষের তুলনায় অনেক কম। এই চরম শ্রম শোষণ ও অবমাননাই ইউরোপীয় নারীদের রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য করে।

রেফারেন্স:

১. পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম – জাস্টিস তকী উসমানী।

২. ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা – বার্নার্ড লুইস (ভাষান্তর: ফারিয়া মাহজাবীন)।

পাঠ ১.৩ "প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা"

দর্শনের আড়ালে নারীর অবমাননাগ্রিক সভ্যতাকে গনতন্ত্র, আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি ধরা হলেও নারীর প্রতি তাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত অমানবিক ও সংকীর্ণ।

গ্রিকদের বিশ্বাস ছিল, নারী হলো শয়তানের চক্রান্ত এবং যাবতীয় অমঙ্গলের উৎস, প্রাচীন গ্রীসে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের সম্মতি আবশ্যক বলে মনে করা হত না। মা-বাবার ইচ্ছানুসারে তাকে বাধ্য করা হত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতা-পিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও প্রভুরূপে বরণ করতে বাধ্য হত। নারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হত এবং সর্বদা তাদেরকে পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভ্রাতা, চাচা, মামা, খালুকে মেনে চলতে হত।

"আইনি মর্যাদা" :

গ্রিক আইনে নারীকে 'নাবালক' হিসেবে গণ্য করা হতো। সারাজীবন তাকে বাবা, স্বামী অথবা কোনো পুরুষ অভিভাবকের অধীনে থাকতে হতো। তার কোনো নিজস্ব সম্পত্তি রাখার অধিকার ছিল না।

"দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি" :

দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের যুগেও গ্রিক সমাজে নারী ছিল পণ্যতুল্য। এন্ডাসকি অহফবৎড়ংশু বলেন, অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্প দংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর যাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।

সক্রেটিস , প্লেটো ও এরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস বলতেন, "নারী হলো যাবতীয় বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস।" সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায় যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু চড়ুই পাখি তা ভক্ষণ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

প্লেটো যদিও কিছু ক্ষেত্রে নারীর শিক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তিনি নারীকে পুরুষের চেয়ে নিচু স্তরের জীব মনে করতেন।

প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল তার *'Politics'* গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, নারী হলো 'অসম্পূর্ণ পুরুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার গ্রন্থে লিখেছেন "নারী প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের চেয়ে নিচু এবং সে শাসিত হওয়ার জন্যই সৃষ্ট।

তাদের মতে, নারী কেবল সন্তান উৎপাদন এবং পুরুষের সেবা করার জন্য সৃষ্ট ।

“পণ্য হিসেবে ব্যবহার”:

গ্রিক সমাজে নারী ছিল কেনা-বেচার পণ্য। তাদের কোনো আইনি সত্তা ছিল না। গ্রিকদের কাছে নারী ছিল কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র এবং লালসা মেটানোর উপকরণ। এমনকি উচ্চবিত্ত গ্রিকরা তাদের স্ত্রীদের ঘরে বন্দি রাখত এবং দাসীদের সাথে সময় কাটাত।

রেফারেন্স: পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৭-২০; ইসলামে নারীর মূল্যায়ন, পৃষ্ঠা ১৭।

পাঠ ১.৪ : “প্রাচীন রোমান সভ্যতা: কঠোর আইন ও দাসত্ব”

রোমান সাম্রাজ্য তার কঠোর আইন বা 'এর জন্য বিখ্যাত, কিন্তু সেই আইন নারীর জন্য ছিল ভয়ানক।রোমান সাম্রাজ্যে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ । রোমান আইনে নারীকে 'পণ্য' বা 'দাসী'র সমতুল্য মনে করা হতো।

পারিবারিক ক্ষমতা :

রোমান পরিবারে পিতার ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। রোমান আইনে 'পারিবারিক কর্তৃত্ব' প্রথার কারণে পিতার অধিকার ছিল তার কন্যাকে বিক্রি করা বা হত্যা করা।

তিনি চাইলে তার কন্যাকে বিক্রি করে দিতে পারতেন, দাসে পরিণত করতে পারতেন বা এমনকি বিনা বিচারে হত্যাও করতে পারতেন।

বিবাহিত নারীর দাসত্ব:

একজন নারী যখন বিয়ে করে স্বামীর ঘরে যেত, তখন সে তার বাবার পরিবারের সমস্ত অধিকার হারাত এবং স্বামীর সম্পত্তিতে পরিণত হতো। রোমান আইনে বলা হতো, "স্ত্রী তার স্বামীর হাতের সামগ্রী মাত্র।" স্বামী তার ওপর বিচারকের ভূমিকা পালন করত । স্বামী তাকে যেকোনো দণ্ড দেওয়ার আইনি ক্ষমতা রাখত এবং ব্যভিচার বা মদ্যপানের অভিযোগে তাকে হত্যা করলে রাষ্ট্র কোনো বাধা দিত না।

সামাজিক অবক্ষয়:

পরবর্তী রোমান যুগে নারীরা এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে, তারা বিয়ে ও পরিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, যা রোমান সমাজের নৈতিক পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

পাঠ-১.৫ “ভারতীয় ও হিন্দু সভ্যতায় নারী :

সতীদাহ ও অধিকারহীনতা”

ভারতীয় সভ্যতায় নারী:

প্রাচীন ভারত ও হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান ছিল অস্থিতিশীল। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের আগে নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত সূচনীয়। নারীদেরকে পাপ, নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হত। তাদেরকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল নীতি।

মনু'র মতে তাকে দিবা রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা দরকার। তিনি বলেন, পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবে দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপদগামী হবে।

হিন্দু সভ্যতায় নারী :

হিন্দু ধর্মের অভিশত ড. গেসটাউলীবানের ভাষায়- হিন্দু ধর্ম মতে তাকদীর, তুফান, মৃত্যু, জাহান্নাম, বিষ ও বিষাক্ত সাপ এত ক্ষতিকর নয়, যত ক্ষতিকর নারী। -তামাদ্দুনে আরব: ৩৭৩

অন্য স্থানে রয়েছে, প্রাচ্যবিদগণ যারা স্বভাবজাত দার্শনিক- মনে করেন, নারী প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে এমন অকৃতজ্ঞা, যেরূপ চড়ুই প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে উড়ার চরিত্র। -তামাদ্দুনে আরব: ৩৭৫

ধর্মীয় বিধিনিষেধ:
প্রাচীন ভারতে নারীকে অশুভ মনে করা হতো । হিন্দু ধর্মশাস্ত্র **'মনুস্মৃতি'** (৫/১৪৭-১৪৮) অনুযায়ী— "নারী কখনোই স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের যোগ্য নয়; তাকে সারাজীবন অন্যের অধিনে থাকতে হবে। তাকে বেদ পাঠ বা ধর্মীয় আচার পালনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হতো না।
হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে (যেমন: মনুস্মৃতি) নারীর মর্যাদা অত্যন্ত নিম্ন ।
অধিকারহীন জীবন:
শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে সে পুত্রের পুত্রের অধীনে থাকা ছিল নারীর নিয়তি। তার নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না"

হিন্দু ধর্মে সতীদাহ প্রথা:

হিন্দু সম্প্রদায়ে **'সতীদাহ'** ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম প্রথা। সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে পুণ্যবতী প্রমাণের নামে জীবন্ত স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় পুড়িয়ে হত্যা করা হতো।এখনো এ বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত রয়েছে।মাত্র কিছু দিন পূর্বেও ভারতে এ প্রথা রহিত করে আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণী বিশেষ। এ জন্যই সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্বামীর চিতায় আত্ম বিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত। তাদের মতে নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নাই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে খুরের ধারালো দিক। এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট। গবহ *Should not love them* নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নয়।
এ সতীদাহ প্রথা ছিল মানবিকতার চরম অবমাননা এবং নারীর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতার উদাহরণ।। তৎকালীন ধর্মগুরুরা একে পুণ্য হিসেবে প্রচার করতেন। যদি কোনো নারী পালিয়ে যেত, তাকে সমাজচ্যুত করা হতো এবং আমৃত্যু লাঞ্ছনার শিকার হতে হতো।
উত্তরাধিকার:
সম্পত্তিতে নারীর কোনো হিস্যা ছিল না। তাকে পরিবারের বোঝা মনে করা হতো এবং বিয়ের সময় বিপুল যৌতুকের প্রথা এখান থেকেই ভয়াবহ আকার ধারণ করে।
রেফারেন্স: ইসলামে নারীর মূল্যায়ন,মুফতী হিফজুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

পাঠ ১.৬: "বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি"

বৌদ্ধ ধর্ম:

বৌদ্ধ সভ্যতায় নারী

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হল, নারীর সহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। এতেই বৌদ্ধ ধর্মে নারীর মর্যাদা সম্মকরূপে উপলব্ধি করা যায়। বিবাহ ও তার আনুসাঙ্গিক কার্যকলাপ বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। এ ধর্মের লক্ষ্য হল, সকল বাসনা-কামনার বিলুপ সাধণ। সুতরাং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য আবশ্যক। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এ তথ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টারমার্ক ডবংঃৎসধৎশ বলেন, মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে তন্মধ্যে নারী-ই সর্বাপেক্ষা বিপদ জনক। নারীর মধ্যে মহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে। যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ্য করে দেয়।

শুরুতে গৌতম বুদ্ধ নারীদের তার সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নারীকে আধ্যাত্মিক সাধনার অন্তরায় মনে করা হতো। তার মতে, নারী হলো প্রলোভনের ফাঁদ যা নির্বাণ লাভের পথে অন্তরায়।

ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম; আদিপাপের দায় ও চার্চের কঠোরতা

ইয়াহুদী ধর্ম:

ইয়াহুদী ধর্মের কিতাবে মুকাদ্দাস (বাইবেলে) নারী সম্পর্কে অভিমত হল এই- সে কে? যে নাপাক থেকে পাক বের করবে। নেই কেউ। (আইউব-অধ্যায় ১৪)

অন্যত্র রয়েছে, এমন মানুষ কে, যে পাক হতে পারে? যে নারী থেকে জন্ম নিয়েছে সে কি করে সত্যবাদী হতে পারে ? অর্থাৎ, ইয়াহুদী ধর্মের দৃষ্টিতে

১. নারী নাপাক।

২. নারী সত্তার মধ্যে সত্যবাদীতা নেই।

এ কারণে তার থেকে যার জন্ম, সে সত্যবাদীতা শূণ্য। এটা কোমল শ্রেণী নারী জাতির প্রতি কত বড় অপবাদ। যার ফলে মর্যাদা আর পবিত্রতা লজ্জায় মাথা নুয়ে ফেলে।

৩. মানুষ যেহেতু নারী থেকে জন্ম, তাই সে পবিত্র হতে পারে না। কেননা, নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব নাপাক। অতএব এমন কে রয়েছে, যে নাপাক থেকে পাক বের করতে পারে?

প্রাচীন ইয়াহুদী আইনে কন্যাসন্তানকে অভিশাপ মনে করা হতো এবং নারী ছিল উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। কন্যা সন্তানকে তারা 'পিতার জন্য গ্লানি' মনে করত। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে মাকে দীর্ঘ সময় অশুচি থাকতে হতো। উত্তরাধিকার সূত্রে সে কেবল তখনই সম্পত্তি পেত যদি তার কোনো ভাই না থাকত।

ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু ব্যাখ্যানুযায়ী নারীকে 'মৃত্যুর চেয়েও তিক্ত' বলা হয়েছে।

খ্রিষ্টীয় ধর্ম:

মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টীয় চার্চের থিওলজি অনুযায়ী, আদিপাপের (*Original Sin)* জন্য নারীকে দায়ী করা হতো। নারীকে 'পাপের মূল' (*The root of all evil*) মনে করা হতো। মধ্যযুগীয় ইউরোপে আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বের হওয়ার জন্য হাওয়া (আঃ)-কে দায়ী করা হতো এবং নারীকে দীর্ঘকাল ধরে অশুচি ভাবা হতো।

৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি ধর্মীয় সেমিনার হয়েছিল যেখানে আলোচনা করা হয়েছিল— "নারীর কি আদৌ আত্মা আছে?"

কাউন্সিলে দীর্ঘ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে— "নারী মানুষ, তবে সে কেবল পুরুষের সেবার জন্যই সৃষ্ট।

মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান পাদ্রীদের মতে, নারী হলো "শয়তানের প্রবেশদ্বার" *(Gate of the Devil)।* তারা বিশ্বাস করত, বিবি হাওয়া (আ.) গন্ধম ফল খেয়ে আদম (আ.)-কে প্ররোচিত করেছিলেন, তাই নারী জাতি হলো আজীবনের পাপী।

"রেফারেন্স: ইসলামে নারীর মূল্যায়ন, পৃষ্ঠা ১৯-২০।

পাঠ ১.৭ "প্রাচীন পারস্য ও চীন সভ্যতা"

প্রাচীন পারস্যে সভ্যতা :

(বর্তমান ইরান এলাকা) নারীর কোনো সামাজিক অবস্থান ছিল না। এমনকি সেখানে নিকটাত্মীয়দের সাথে বিবাহের মতো কুরুচিপূর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীকে গৃহবন্দি করে রাখার সংস্কৃতি সেখানে চরম আকারে ছিল।

চীন সভ্যতায় নারী:

পৃথিবীর মধ্যে চীন দেশেই নারীর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীন ধর্ম গ্রন্থে নারীকে ডধঃবৎং ড়ভ ড়িব (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী কখনো কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না। এমনকি তার সন্তানদের উপরও তার কোন

অধিকার থাকতো না। স্বামীর যখন ইচ্ছা তাকে তালাক দিতে পারতো এবং অপরের উপপত্নী রূপে তাকে বিক্রয়ও করতে পারতো। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুন: বিবাহ প্রায় অসম্ভব ছিল। চীন দেশে নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈকা চীন দেশীয় নারী বলেন, মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। ... অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস নারী সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী। জগতে নারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।

চীনে কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে চরম দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করা হতো। কন্যা শিশুকে অনাহারে মেরে ফেলা বা বিক্রি করে দেওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। চীনাদের বিশ্বাস ছিল, "নারীর কথা শোনা মানেই অমঙ্গল ডেকে আনা।”

পাঠ :১.৮ “জাহিলিয়াতের যুগে নারী ও কন্যা সন্তান হত্যা”

ইসলাম-পূর্ব আরব বা জাহিলী যুগে নারীর অবস্থা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম একটি অন্ধকার অধ্যায়।

রাসূল (সাঃ) আগমনের পূর্বে আরবে নারীর কোনো মানবিক অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না। নারী ছিল কেবল লালসা মেটানোর বস্তু। কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়া ছিল তাদের জন্য চরম লজ্জার বিষয়। আরবে নারীকে মিরাসের অধিকার দেওয়া হতো না; বরং নারী নিজেই মিরাস বা উত্তরাধিকার হিসেবে এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হতো।

কন্যা সন্তানের উপর নির্যাতন :

আরবে জাহেলিয়্যাতের যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল মারাত্মক একটি দোষনীয় ব্যাপার। চরম যিল্লতী ও অপমানের কারণ মনে করা হত একে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের সূরা আন-নাহলে এর ভয়াবহ চিত্র অংকন করেছেন এই ভাবে-

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হত, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যেত এবং সে ক্লিষ্ট হয়ে যেত অসহনীয় মনাস্তপে। তাকে যে, সংবাদ দেয়া হত তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করত। সে চিন্তা করত, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে প্রোথিত করবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।

-সূরা আন-নাহল ৫৮, ৫৯।

কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন:

অভাবের ভয়ে কিংবা আভিজাত্য রক্ষার নামে তারা ফুটফুটে কন্যা শিশুকে মরুভূমিতে জীবন্ত কবর দিত।

জাহেলী যুগে মেয়েদের সাথে কি করুণ নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো ।। তাফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- আল্লামা বাগভী র. লিখেছেন, মুযার, খুযা'আ এবং বধূ তামীম গোত্রে মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। এর কারণ ছিল দু'টি ক. দারিদ্রতার ভয়। খ. অসম গোত্রের নিকট থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসার আশংকা।

আরবে এরূপ গোত্রগুলোর মধ্যে মেয়ে হলে তাদের জীবিত রাখতে চাইলে তাদেরকে ভেড়া-বকরীর পশম দ্বারা তৈরী পোশাক পরিয়ে জঙ্গল আর ময়দানে উট-ছাগল চরানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দিত। আর যদি তাদের জীবন্ত না রাখা মনস্থ হত, তাহলে ৫/৬ বৎসর পর্যন্ত এমনিই রেখে দিত। ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পন করলে মেয়ের মাকে নির্দেষ দিত, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার জন্য নিয়ে মেয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে। পূর্ব থেকেই ময়দানে-জঙ্গলে কুপ খনন করে রাখা হত। সে মেয়ে নিয়ে কুপের কিনারায় গিয়ে বলত কুপের দিকে তাকিয়ে দেখ, আর অমনি পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে কুপে ফেলে দিয়ে তাতে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসত। মাটি ভরে জমিন বরাবর করে দিত।

-তাফসীরে মাযহারী, সূরা নাহল: ২৬, ৫/৩৪৮।

নিজ মেয়ে হত্যার এক লোমহর্ষক কাহিনী :

একবার এক আরব সরদার হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে এরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিলে হযরতের দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তাঁর মন এরূপ ভারাক্রান্ত হয়েছিল, যার ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই জবান মুবারক থেকে এ বাক্য নিঃসৃত হল- আল্লাহর কসম এটি বড় পাষাণ হৃদয়ের কাজ। যে দয়া করবে না তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে না

সে আরব নেতা তার সে ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন নিম্নরূপ- আমার ঘরে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছিল। আমি ছিলাম তখন সফরে। আমার স্ত্রী আমার ভয়ে সে কন্যা শিশুকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বোনের কাছে। আমি সফর থেকে ফিরে আসলে সে মিছামিছি আমাকে বলে দিল, বাচ্চাটি মৃত জন্ম হয়েছিল। যা বলার বলল, যা হবার হয়ে গেল। এদিকে সে শিশু লালিত পালিত হচ্ছিল তার খালার নিকটে। আমার অনুপস্থিতিতে একদিন সে শিশুকন্যা তার মায়ের সাথে সাক্ষাতে এল। ঘটণাচক্রে

আমিও সেদিন এসে উপস্থিত হলাম। শিশু কন্যাটিকে দেখে আমি বললাম, এটি কার বাচ্চা? যেহেতু আমি তখন শিশুটির প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম, সেহেতু তার মা মনে করল, রক্তের স্বাভাবিক সম্পর্কের কারণেই আমি প্রভাবিত হয়ে পড়েছি। ফলে তার সাথে আমি নির্মম আচরণ করব না। পক্ষান্তরে আমার অবস্থাটাও তখন অনুরূপ ছিল। আমি তাকে লালন-পালনের অনুমতি দিয়ে দেই। অবশেষে একদিন আমার মাথায় জাহেলিয়্যাতের তথাকথিত আত্মমর্যাদাবোধ এমনিভাবেই চেপে বসে, যার ফলে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে টালবাহানা করে সেই শিশু কন্যাটিকে জঙ্গলে নিয়ে যাই। খুঁড়তে আরম্ভ করি গর্ত। গর্ত খুঁড়বার সময় শিশু কন্যাটি আমার কাপড় জড়িয়ে ধরে নিস্পাপ হাতে। আমি তাকে ছাড়িয়ে দেই কৃত্রিম স্নেহে। গর্তের কাজ সমাপ্ত হলে সে অবলা শিশুটিকে তাতে দাঁড় করাই। মাটি ফেলতে শুরু করি। যখনমাটি ফেলতে আরম্ভ করি, তখন এরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় যে, বাচ্চাটি অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে, আর আমাকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, আব্বু! তুমি একি করছ? কসম, বল, তুমি কি করতে যাচ্ছ? তুমি কি এরূপ নির্মম আচরণ করে নির্জনে আমাকে ফেলে যাবে? শিশুটির নিষ্পাপ আওয়াজ আমার কর্ণকুহরে পড়ে সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করেছিল, চোট লাগছিল অন্তরের গহীনে প্রচন্ড ভাবে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও উম্মাদের ন্যায় আমি আমার কর্ম সমাধা করেছি। তাকে মাটির গর্তে প্রোথিত করে চলে এসেছি আপন নীড়ে। (জাহিলিয়্যাতের কথিত সেই আত্মমর্যাদা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে)। জাহেলী যুগের নির্মম ইতিহাস রয়েছে এরূপ হাজারো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই জঘন্য কাজের কঠোর নিন্দা করে বলেন:

وَاِ ذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَ يِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত পুঁতে-ফেলা কন্যা-শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"

—(সুরা তাকভীর ৮১ : আয়াত ৮-৯)

তাফসীর ও ব্যাখ্যাঃ–

১. প্রেক্ষাপট (জাহেলী প্রথা):

ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবের কিছু গোত্রে (যেমন- বনু তামীম) কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে চরম লজ্জাজনক ও অর্থনৈতিক বোঝা মনে করা হতো। এ কারণে তারা জীবন্ত কন্যাসন্তানকে মাটিতে পুতে ফেলত বা হত্যা করত। এই জঘন্য প্রথাকে আরবী ভাষায় 'মাওউদা' (الْمَوْءُودَةُ) বলা হয়।

তাফসীর বিশ্লেষণ:

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে মুফতী শফী (রহ.) এই আয়াতের অধীনে উল্লেখ করেছেন যে, জাহেলী আরবে মানুষ যখন দেখত যে কারো মেয়ে হয়েছে, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যেত। তারা ভাবত একে কি অপমান সহ্য করে বাঁচিয়ে রাখব নাকি জীবন্ত দাফন করব? আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন সেই খুনি পিতাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।

পাঠ ১.৯ "অন্ধকার যুগে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা"

ইতিহাসের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সপ্তম শতাব্দীতে বিশ্ব যখন নারীবিদ্বেষ, কন্যা হত্যা এবং মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত ছিল, তখন একজন ত্রাণকর্তার আগমন ছিল সময়ের দাবি। ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলাম কেবল একটি ধর্ম হিসেবে নয়, বরং নারী জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

কুরআনের আলোকে :

জাহেলী যুগে নারী ছিল অধিকারবঞ্চিত, অথচ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন যে, নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে সৃষ্ট এবং তারা একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহ বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا
لًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚوَا تَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَا لْاَ رْحَا مَ ۗاِنَّ اللهَ كَا نَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হাক্ব) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

—(সূরা নিসা: ০১)

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রথম এই বৈপ্লবিক ঘোষণা দেয় যে, নারী কোনো তুচ্ছ বস্তু নয়, বরং সে পুরুষের মতোই পূর্ণাঙ্গ এক সত্তা। আরবের সেই অন্ধকার যুগে যেখানে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করা হতো, সেখানে কুরআন ঘোষণা করল—

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَا دَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَا قٍ ؕنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِ يَّا كُمْ ؕاِنَّ قَتْلَهُمْ كَا نَ خِطْاً كَبِيْرًا

"দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"

—(সূরা ইসরা: ৩১)

হাদিসের আলোকে:

،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ :يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম নিল এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দিল না, তার সাথে অপমানজনক আচরণ করল না এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য দিল না, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

—মুসনাদে আহমাদ (১:২২৩), সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং-৫১৪৬),

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ " . وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

আমর আন্ নাকিদ (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুটি মেয়ে সন্তানকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিনে সে ও আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকব, এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দিলেন।

—সহিহ মুসলিম:৬৫৮৯-(১৪৯/২৬৩১)

* *এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:*

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কন্যা সন্তান প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি হলো মহান আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করার উপাদান। এবং কন্যা সন্তানদেরকে যত্নসহকারে প্রতিপালন করা হলো একটি সহজ বিষয়। আর তাদের প্রতি একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ করলে জান্নাত পাওয়া যায়। ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগে কন্যাসন্তানকে অপমানের কারণ মনে করা হতো, কিন্তু রাসূল (সা.) ইসলামের মাধ্যমে কন্যাসন্তানদের সম্মানিত সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সারসংক্ষেপ:

তৎকালীন গ্রিক, রোমান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিকরা যখন নারীর আত্মা আছে কি না তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিল, ইসলাম তখন নারীকে জান্নাতের চাবিকাঠি ও গৃহের রানী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং, মানবতাকে বর্বরতা থেকে রক্ষা করতে এবং নারীকে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতেই ইসলামের বিধানের অপরিহার্যতা ছিল অনস্বীকার্য। ইসলামের এই ইনসাফভিত্তিক নীতিমালার মাধ্যমেই ইতিহাসের দীর্ঘতম নারী লাঞ্ছনার যুগের অবসান ঘটে।

||২য় অধ্যায়||

“নারীবাদের উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রকারভেদ”

পাঠ ২.১: নারীবাদের সংজ্ঞা, দার্শনিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

১. নারীবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ :

'নারীবাদ' বা *'Feminism'* শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ *'Femina'* থেকে, যার অর্থ নারী। তাত্ত্বিকভাবে, নারীবাদ হলো এমন একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ যা লিঙ্গীয় বৈষম্য নিরসন এবং নারীর পূর্ণাঙ্গ অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। তবে আধুনিক গবেষকদের মতে, নারীবাদ কেবল অধিকারের দাবি নয়, বরং এটি একটি *'Counter-Ideology'* বা প্রতি-মতাদর্শ যা প্রচলিত সকল ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে।

গবেষক মারিয়াম তানহা তাঁর 'বিহাইন্ড ফেমিনিজম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমান নারীবাদ কেবল নারীর ইনসাফ নিশ্চিত করতে চায় না, বরং এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করে এক নতুন 'লিঙ্গ-নিরপেক্ষ' সমাজ গঠন করতে চায়।

২. ঐতিহাসিক পটভূমি ও অনিবার্যতার কারণ :

নারীবাদের উদ্ভব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি ছিল পাশ্চাত্য সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক চরম 'প্রতিক্রিয়া'। এর প্রেক্ষাপট বুঝতে নিচের তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

ফরাসি বিপ্লব ও স্বাধীনতার চেতনা (১৭৮৯):

ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র স্লোগান যখন ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নারীরা প্রশ্ন তোলে যে— এই সাম্য কি কেবল পুরুষদের জন্য? ১৭৯১ সালে অলিম্প ডি গজেস (Olympe de Gouges) 'নারীর অধিকারের ঘোষণা' (Declaration of the Rights of Woman) প্রচার করেন, যা নারীবাদের অন্যতম প্রাথমিক ভিত্তি।

শিল্প বিপ্লব ও অর্থনৈতিক রূপান্তর:

১৮শ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ঘর থেকে কল-কারখানায় চলে যায়। এর ফলে নারীরা সস্তা শ্রমিকে পরিণত হয়। 'ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা' বইয়ের

তথ্যমতে, কল-কারখানার মালিকরা মুনাফা বাড়াতে নারীদের নিযুক্ত করত ঠিকই, কিন্তু তাদের কোনো আইনি নিরাপত্তা ছিল না। এই অর্থনৈতিক শোষণই নারীবাদী আন্দোলনের ইন্ধন যোগায়।

খ্রিস্টীয় চার্চ ও ধর্মীয় বঞ্চনা:

তৎকালীন ইউরোপীয় চার্চ মনে করত নারী হলো 'শয়তানের প্রবেশদ্বার'। নারীদের জ্ঞানচর্চাকে তারা পাপ মনে করত। চার্চের এই চরম নারীবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে এবং তারা সেক্যুলার বা ধর্মহীন এক জীবন দর্শনের (নারীবাদ) দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৩. দার্শনিক ভিত্তি (*Philosophical Foundations):*

নারীবাদের দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং মানবতাবাদ এর ওপর।

নারীবাদের পটভূমিতে বাস্তব উদাহরণ:

মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট (*Mary Wollstonecraft):*

১৭৯২ সালে তাঁর রচিত *'A Vindication of the Rights of Woman'* গ্রন্থে তিনি প্রথম দাবি করেন যে, নারীরা প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ অপেক্ষা হীন নয়, বরং শিক্ষার অভাবেই তারা পিছিয়ে আছে। তাকে আধুনিক নারীবাদের জননী বলা হয়।

১৭৯২ সালে প্রকাশিত তার *'A Vindication of the Rights of Woman'* গ্রন্থের প্রধান **৩**টি দিক নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. যৌক্তিক সক্ষমতা ও শিক্ষার দাবি (*Rationality and Education*):

ওলস্টোনক্রাফট যুক্তি দেন যে, নারীরা প্রকৃতিগতভাবে পুরুষদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান নয়; বরং তাদের শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে কেবল 'তুচ্ছ' কাজে ব্যস্ত রাখা হয় বলেই তারা পিছিয়ে থাকে। তিনি দাবি করেন, নারীদের যদি পুরুষের মতো সুশৃঙ্খল শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তারা কেবল ভালো মা বা স্ত্রী নয়, বরং সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারবে।

খ.নারীত্বের সামাজিক প্রথা বনাম প্রকৃত স্বভাব (*Social Construction of Femininity):*

তিনি অভিযোগ করেন যে, তৎকালীন সমাজ নারীদের এমনভাবে বড় করে যেন তারা কেবল পুরুষদের মনোরঞ্জন এবং তাদের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে থাকাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করে। তিনি একে 'এক ধরণের দাসত্ব' হিসেবে অভিহিত করেন। তার

মতে, নারীদের নম্রতা বা কমনীয়তাকে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে না দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনে উৎসাহিত করা উচিত।

গ. পারিবারিক ও নাগরিক অংশীদারিত্ব (*Domestic and Civic Duty):*

ওলস্টোনক্রাফট মনে করতেন, একজন নারী তখনই একজন আদর্শ মাতা এবং সুগৃহিণী হতে পারবেন, যখন তিনি মানসিকভাবে স্বাধীন এবং শিক্ষিত হবেন। তিনি বলেন, নারী যদি তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে সে তার সন্তানদের সঠিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে। তাই পরিবার ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশীদারিত্ব থাকা প্রয়োজন।

ঘটনা:

মেরি ওলস্টোনক্রাফটের লড়াইনারীবাদের জননী বলা হয় মেরি ওলস্টোনক্রাফটকে। তিনি যখন *'A Vindication of the Rights of Woman'* লেখেন, তখন তাকে 'যৌন বিকৃত' নারী হিসেবে গালি দেওয়া হয়েছিল। কারণ তিনি কেবল দাবি করেছিলেন যে, নারীকেও পুরুষের মতো বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হোক। তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ তাকে এতটাই ঘৃণা করত যে, তার মৃত্যুর পর তার ব্যক্তিগত ডায়েরি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

উদাহরণ: তৎকালীন ইউরোপে একজন বিবাহিত নারী কোনো অপরাধ করলে তার বিচার হতো না, বরং তার স্বামীকে শাস্তি দেওয়া হতো। কারণ আইনের দৃষ্টিতে নারীর কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না, সে ছিল স্বামীর একটি 'অঙ্গ' মাত্র। এই চরম অবমাননাই নারীবাদকে একটি শক্তিশালী দর্শনে রূপ দেয়।

রেফারেন্স:

১. পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম – জাস্টিস তকী উসমানী, পৃষ্ঠা ২৪-২৬।

২. *A Vindication of the Rights of Woman – Mary Wollstonecraft.*

জন স্টুয়ার্ট মিল ও নারীবাদের দার্শনিক ভিত্তিজন:

"নারীবাদের তাত্ত্বিক জনক: জন স্টুয়ার্ট মিল"(J.S Mill):

স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ছিলেন একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিক। তাকে উদারপন্থী নারীবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা মনে করা হয়। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *'The Subjection of Women'* (নারীর

পরাধীনতা) নারীবাদের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। গ্রন্থে তিনি যুক্তি দেখান যে, লিঙ্গীয় অসমতা মানব জাতির উন্নতির পথে একটি বিশাল বাধা।

ক. জন স্টুয়ার্ট মিলের মূল দর্শন:

যুক্তি ও উপযোগবাদ মিল মনে করতেন, সমাজ যদি তার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে (নারী) ঘরে বন্দি করে রাখে, তবে সেই সমাজ কখনোই তার পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছাতে পারবে না। তার মতে, নারী-পুরুষের বৈষম্য কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নয়, বরং এটি একটি কৃত্রিম সামাজিক প্রথা।মিল যুক্তি দেখান যে, আমরা জানি না নারীরা প্রাকৃতিকভাবে কী করতে সক্ষম, কারণ আমরা তাদের কখনো সুযোগই দেইনি।যদি নারীদের মেধা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজে লাগানো যায়, তবে সামগ্রিক মানবজাতির কল্যাণ হবে।

খ. 'The Subjection of Women' গ্রন্থের প্রধান দিকসমূহ:

এই বইটিতে মিল তিনটি প্রধান বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তা হলো:

বিবাহিত নারীর দাসত্ব:

তৎকালীন ইংরেজ আইনে বিবাহিত নারী ছিল স্বামীর আইনি দাসী। মিল এই প্রথাকে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার সাথে তুলনা করেন। তিনি বলেন, "বিবাহ হলো একমাত্র চুক্তি যেখানে দাসীকে (স্ত্রী) তার প্রভুর (স্বামী) সাথে সারাজীবন থাকতে বাধ্য করা হয়।

"শিক্ষা ও ভোটাধিকার:

মিল বিশ্বাস করতেন, নারীদের সমান ভোটাধিকার এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিলে তারা পুরুষের সমান দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

সাংস্কৃতিক দাসত্ব:

মিল চমৎকার একটি পয়েন্ট তুলে ধরেন যে, পুরুষরা কেবল নারীর শ্রম চায় না, তারা নারীর 'মন' চায়। তাই তারা এমনভাবে নারীদের বড় করে যেন নারীরা মনে করে পুরুষের সেবা করাই তাদের জীবনের লক্ষ্য।

রেফারেন্স:১.*The Subjection of Women – J.S. Mill (Original Work).*

২. *Stanford Encyclopedia of Philosophy: "John Stuart Mill".*

৪. নারীবাদের মূল লক্ষ্য ও বর্তমান রূপ:

শুরুতে নারীবাদের লক্ষ্য মানবিক থাকলেও বর্তমানে এটি 'লিঙ্গীয় রাজনীতি'র রূপ নিয়েছে। 'বিহাইন্ড ফেমিনিজম' বইয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আধুনিক নারীবাদ এখন

কেবল 'অধিকার' চায় না, বরং তারা পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা, মাতৃত্বের অবমূল্যায়ন এবং অবাধ যৌনাচারকে স্বাধীনতার মাপকাঠি হিসেবে প্রচার করছে।

রেফারেন্স:

১. বিহাইন্ড ফেমিনিজম, মারিয়াম তানহা, পৃষ্ঠা ১৫-২২।

২. ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা, বার্নার্ড লুইস (ভাষান্তর: ফারিয়া মাহজাবীন)

৩. *Stanford Encyclopedia of Philosophy: "Feminist Philosophy".*

8. *Britannica Academic: "History of Feminism".*

পাঠ ২.২: "নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ (First Wave: ১৮৪৮-১৯২০)"

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ মূলত ছিল 'আইনি ও রাজনৈতিক সমতা' অর্জনের লড়াই। এটি 'নাগরিক আইন ও রাজনৈতিক অধিকার' আদায়ের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীদের পণ্যতুল্য অবস্থা ছিল । সমাজে নারীরা আইনি ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল। তার বিরুদ্ধে এটি ছিল এক সুসংগঠিত বিদ্রোহ। এই চরম বঞ্চনা থেকেই প্রথম তরঙ্গের জন্ম হয়।

১. প্রধান দাবি ও লক্ষ্যসমূহ (*Core Demands):*

প্রথম তরঙ্গের নারীবাদীরা যেসব দাবি তুলেছিলেন, সেগুলো তৎকালীন পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় ছিল এক বৈপ্লবিক বিদ্রোহ। ভোটাধিকার, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার প্রথম তরঙ্গের নারীবাদীদের প্রধান তিনটি দাবি ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ।নিচে এগুলোর বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

ভোটাধিকার (*Suffrage):*

তৎকালীন গণতন্ত্রে নারীকে 'অপরিণত বুদ্ধি'র মনে করা হতো, তাই তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। তৎকালীন সময়ে যুক্তি দেওয়া হতো যে, নারীর রাজনৈতিক

জ্ঞান নেই, তাই তারা ভোট দিলে সমাজ ভারসাম্য হারাবে। তাই নারীবাদীরা দাবি করেন যে, যেহেতু নারীরাও কর (*Tax*) প্রদান করে, তাই রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে তাদের মত প্রকাশের অধিকার থাকা আবশ্যক। নারীবাদের মতে রাষ্ট্র পরিচালনায় যতক্ষণ নারীর কণ্ঠস্বর (ভোট) না থাকবে, ততক্ষণ তাদের জন্য কোনো ইনসাফভিত্তিক আইন তৈরি হবে না। এর প্রতিবাদে 'সাফ্রেজেট' (*Suffragettes*) আন্দোলন তীব্র হয়।
এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন এলিস পল এবং সুসান বি. অ্যান্থনি। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, "নারীদের জন্য আইন তৈরির অধিকার কেবল পুরুষদের হাতে থাকা এক ধরণের স্বৈরাচার।”

শিক্ষার অধিকার:

১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ডের মতো বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাদের কেবল ঘরোয়া কাজ ও সেলাই শেখার যোগ্য মনে করা হতো। তারা দাবি করে যে, নারীদের কেবল 'ভালো স্ত্রী' হওয়ার জন্য নয়, বরং 'ভালো মানুষ' হওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন
১৮৩৭ সালে ওবারলিন কলেজ (*Oberlin College)* প্রথম নারীদের ডিগ্রির সুযোগ দেয়। এই দাবিটি ছিল মূলত নারীর মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অস্তিত্বের লড়াই।

বিবাহিত নারীর সম্পত্তির অধিকার :

পাশ্চাত্য আইনের 'কভারচার’ '(*Coverture*)' আইন অনুযায়ী, বিয়ের পর নারীর যাবতীয় সম্পত্তি স্বামীর হয়ে যেত। এমনকি নারীর উপার্জিত অর্থও স্বামী নিয়ে নিতে পারত। সে সময় তালাকের অধিকার কেবল পুরুষদের ছিল এবং বিচ্ছেদের পর সন্তানদের ওপর মায়ের কোনো আইনি অধিকার থাকত না।১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে *'Married Women's Property Act'* পাসের জন্য লড়াই করে ।

রেফারেন্স:

১.ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা – বার্নার্ড লুইস, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৬।
২.বিহাইন্ড ফেমিনিজম, মারিয়াম তানহা, পৃষ্ঠা ৩০-৩২।

২.আইনি প্রেক্ষাপট: 'কভারচার' (*Coverture*) নামক অভিশাপ :

প্রথম তরঙ্গের আন্দোলনের মূল কারণ ছিল তৎকালীন ইউরোপীয় ও আমেরিকান আইন। সেখানে 'কভারচার' নামক একটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। এর মূল কথা ছিল— "বিবাহিত নারী আইনের চোখে মৃত।"

বিয়ের পর একজন নারীর কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব থাকত না। তার সম্পত্তি, উপার্জন, এমনকি তার নিজের শরীরের ওপরও স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার ছিল। নারী কোনো আইনি চুক্তিতে সই করতে পারত না বা নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারত না।

৩.ভোটাধিকার আন্দোলন :

এমিলি ডেভিসনের আত্মত্যাগ (১৯১৩) নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে ভোটাধিকার আদায়ের জন্য নারীরা কতটা মরিয়া ছিল তার একটি চরম উদাহরণ হলো এমিলি ডেভিসন। ১৯১৩ সালে ইংল্যান্ডের 'এপসম ডার্বি' ঘোড়দৌড়ের সময় তিনি নারীদের ভোটাধিকারের ব্যানার নিয়ে রাজা পঞ্চম জর্জের দ্রুতগামী ঘোড়ার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্রাণ হারান। এই ঘটনা পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

উদাহরণ: আমেরিকায় 'সেনেকা ফলস কনভেনশন' (১৮৪৮)-এ যখন এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন প্রথম নারীর ভোটাধিকারের দাবি তোলেন, তখন খোদ নারীদের মধ্যেই হাসাহাসি পড়ে গিয়েছিল। সমাজ ভাবত, নারী যদি ভোট দেয় তবে 'প্রকৃতি' তার স্বাভাবিক নিয়ম হারাবে।

৪.প্রেক্ষাপট: মেরি ওলস্টোনক্রাফটের লেখনী ও 'সেনেকা ফলস কনভেনশন'এই আন্দোলনের দুটি প্রধান স্তম্ভ ছিল:

তাত্ত্বিক ভিত্তি:

১.মেরি ওলস্টোনক্রাফটের *'A Vindication of the Rights of Woman'* (১৭৯২) বইটি নারীদের মনে প্রথম এই প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে যে, "আমরা কি কেবল পুরুষের সেবাদাসী?" তিনি যুক্তি দেন যে, পুরুষরা যেমন যুক্তিমান প্রাণী, নারীরাও তাই।

২. প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা ;সেনেকা ফলস কনভেনশন (১৮৪৮):

ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ;নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ১৯-২০ জুলাই, আমেরিকার নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলস (*Seneca Falls*) নামক স্থানে। সেখানে প্রায় *৩০০* নারী-পুরুষ সমবেত হন। এই সম্মেলনে এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন বিখ্যাত 'ডিক্লারেশন অফ সেন্টিমেন্টস'(

Declaration of Sentiments)'পাঠ করেন।সেখানে তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে ঘোষণা করেন— "আমরা মনে করি এই সত্যটি স্বতসিদ্ধ যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই সমানভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

এটি ছিল আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার অনুকরণে তৈরি, যেখানে দাবি করা হয়— "নারী ও পুরুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

৩. ফলাফল: ১৯২০ ও ১৯২৮ সালের আইনি বিজয়দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর প্রথম তরঙ্গ সফলতার মুখ দেখে।আমেরিকা (**১৯২০**): মার্কিন সংবিধানের **১৯তম** সংশোধনীর মাধ্যমে নারীরা পূর্ণ ভোটাধিকার লাভ করে।ব্রিটেন (**১৯২৮**): 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ নারীরা পুরুষদের সমান ভোটাধিকার পায়।ঐতিহাসিক উদাহরণ: এই বিজয়ের পেছনে এমিলি ডেভিসন-এর মতো নারীদের চরম আত্মত্যাগ কাজ করেছিল, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. ঐতিহাসিক ঘটনা:

'নাইট অফ টেরর' (*Night of Terror,* **১৯১৭**): ভোটাধিকার আদায়ের লড়াই কতটা কঠিন ছিল, তা বোঝা যায় এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে।**১৯১৭** সালের **১৪ই** নভেম্বর, এলিস পলের নেতৃত্বে 'সাইলেন্ট সেন্টিনেলস' (*Silent Sentinels*) নামক একদল নারী হোয়াইট হাউসের সামনে নীরবে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিলেন। তাদের অপরাধ ছিল— তারা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে ভোটাধিকার দাবি করেছিলেন।

নিষ্ঠুর নির্যাতন: আমেরিকার ৩৩ জন নারীকে হোয়াইট হাউসের সামনে নিরব প্রতিবাদ করার জন্য জেলে পাঠানো হয়। আটককৃত ৩৩ জন নারীকে ভার্জিনিয়া'র 'ওকোকুয়ান ওয়ার্কহাউস' (*Occoquan Workhouse*) নামক কারাগারে পাঠানো হয়। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ডব্লিউ.এইচ. হুইটেকার রক্ষীদের নির্দেশ দেন নারীদের 'উচিত শিক্ষা' দিতে। রক্ষীরা নারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তাদের হাত হ্যান্ডকাফ দিয়ে উঁচু করে বেঁধে রাখা হয়েছিল! লুসি বার্নস নামক একজন নারীকে লোহার শিকের সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে সারা রাত উঁচু করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

Force-feeding): নারীরা যখন জেলের ভেতর অনশন শুরু করেন, তখন জেলের রক্ষীরা তাদের নাকে রাবারের পাইপ ঢুকিয়ে জোর করে কাঁচা ডিম ও দুধ খাওয়ানো হতো। এই প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং অনেক নারী এতে রক্তবমি শুরু

করেছিলেন।এই ত্যাগই পরবর্তীকালে আমেরিকার ১৯তম সংশোধনী (ভোটাধিকার) আনতে বাধ্য করে।

এই নির্যাতনের খবর যখন বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন পুরো আমেরিকার বিবেক কেঁপে ওঠে। জনগণের চাপে ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ভোটাধিকার বিল সমর্থন করতে বাধ্য হন। ১৯২০ সালে ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে এটি আইন হিসেবে গৃহীত হয়।

সোজার্নার ট্রুথ ও *'Ain't I a Woman?'* (আমি কি নারী নই?)

১৮৫১ সালে ওহাইও-র একটি সম্মেলনে কৃষ্ণাঙ্গ নারী সোজার্নার ট্রুথ এক কালজয়ী ভাষণ দেন। তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ নারীরা বলতেন, নারীরা কোমল, তাদের সাহায্য দরকার। ট্রুথ তার পেশীবহুল হাত দেখিয়ে বলেছিলেন—"আমি মাঠে লাঙল চালিয়েছি, ফসল কেটেছি... কোনো পুরুষ আমাকে সাহায্য করেনি। তবে কি আমি নারী নই?"

এই বক্তব্যটি প্রমাণ করে যে, প্রথম তরঙ্গের আন্দোলন কেবল উচ্চবিত্তের ছিল না, বরং সাধারণ খেটে খাওয়া নারীর প্রাণের দাবি ছিল।

৬.প্রথম তরঙ্গের সমাপ্তি ও অর্জন:

১৯২০ সালে আমেরিকার সংবিধানে ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীরা ভোটাধিকার পায়। ব্রিটেনে ১৯২৮ সালে নারীরা সমান ভোটাধিকার অর্জন করে। এর মাধ্যমে প্রথম তরঙ্গের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

৭. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ:

প্রথম তরঙ্গে নারীরা যে মৌলিক অধিকারগুলো (যেমন: সম্পত্তি, মোহরানা, শিক্ষা, সম্মতির অধিকার) পাওয়ার জন্য প্রায় ১০০ বছর লড়াই করেছে এবং রক্ত দিয়েছে, ইসলাম সেই অধিকারগুলো কোনো আন্দোলন ছাড়াই ১৪০০ বছর আগে নারীর জন্য নিশ্চিত করেছিল। পাশ্চাত্য আইন যেখানে নারীকে 'মৃত' মনে করত, ইসলাম তখন তাকে 'গৃহের রানী'র মর্যাদা দিয়েছিল।

রেফারেন্স: ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার – সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ৪৫-৫০।

পাঠ ২.৩ নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ (Second Wave: ১৯৬০-১৯৮০)

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে আমেরিকায় নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সূচনা হয়। প্রথম তরঙ্গের লক্ষ্য ছিল 'আইনি সমতা এবং রাজনৈতিক অধিকার (যেমন: ভোটাধিকার বা সম্পত্তি) কেন্দ্রিক, কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গে নারীবাদীরা দাবি করে যে, কেবল আইন পরিবর্তন করলেই নারীর মুক্তি সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় তরঙ্গের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক ভূমিকা এবং লিঙ্গীয় রাজনীতির মূলে আঘাত করা। এটি নারীর ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং যৌনতার মতো বিষয়গুলোকে জনসমক্ষে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় তরঙ্গ এর মূল স্লোগান ছিল— "The Personal is Political" (ব্যক্তিগত বিষয়ই রাজনৈতিক)। অর্থাৎ, নারীর অন্দরমহলের জীবন ও সিদ্ধান্তগুলোও রাজনীতির অংশ।

১. প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস:

বেটি ফ্রাইডানের 'দ্য ফেমিনিন মিস্টিক' (*The Feminine Mystique):*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য নারীরা পুনরায় গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিল। **১৯৬৩** সালে বেটি ফ্রাইডান (*Betty Friedan*) তার যুগান্তকারী গ্রন্থ *'The Feminine Mystique'*-এ এক অদ্ভুত সমস্যার কথা বলেন। এ গ্রন্থে পাশ্চাত্য গৃহিনীদের এক ধরণের মানসিক অস্থিরতাকে'নামহীন এক সমস্যা' (*The Problem That Has No Name)*হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি দাবি করেন যে, ঘর-সংসার সুখী হওয়ার ভান করলেও পাশ্চাত্য নারীরা মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত। নারীর জীবন ঘর-সংসার ও সন্তান লালন-পালনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকাটা এক ধরণের 'মানসিক বন্দিত্ব'। এই ধারণা পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যে গৃহিনী জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করে।এই 'দমবন্ধ' করা পরিবেশ থেকেই দ্বিতীয় তরঙ্গের বিস্ফোরণ ঘটে।

রেফারেন্স: বিহাইন্ড ফেমিনিজম – মারিয়াম তানহা, পৃষ্ঠা ৩৮-৪২।

২. ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়ারের দর্শন ও লিঙ্গীয় অস্তিত্ববাদ:

দ্বিতীয় তরঙ্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন সিমোন দ্য বোভোয়ার (*Simone de Beauvoir*)। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত (যা ৬০-এর দশকে জনপ্রিয় হয়) তার *'The Second Sex'* গ্রন্থে তিনি একটি বৈপ্লবিক ও বিপজ্জনক তত্ত্ব দেন:*"One is not born, but rather becomes, a woman."* (কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং সমাজ তাকে নারী হিসেবে তৈরি করে।)এই তত্ত্বের মাধ্যমে বোভোয়ার দাবি করেন যে, মাতৃত্ব

বা গৃহিণী হওয়া নারীর কোনো স্বভাবজাত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া এক 'সংস্কৃতি'।

সিমোন দ্য বোভোয়ার তার বইয়ে লিখেছিলেন- "মা হওয়া নারীর জন্য এক ধরণের অভিশাপ"! তিনি নিজে কখনও বিয়ে করেননি এবং সন্তান নেননি। তাঁর এই দর্শন হাজার হাজার পাশ্চাত্য নারীকে পরিবার ও মাতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। যার ফলে সত্তরের দশকে ইউরোপে বিবাহ বিচ্ছেদের হার অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়। বোভোয়ারের এ উগ্র দর্শনটি পারিবারিক বন্ধন শিথিল করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।এই ধারণাটিই পরবর্তীকালে আধুনিক জেন্ডার থিওরির ভিত্তি রচনা করে।

রেফারেন্স: ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা বার্নার্ড লুইস, পৃষ্ঠা ৫০-৫২।

৩. প্রধান দাবি ও বিতর্কের ক্ষেত্রসমূহ (বিস্তারিত আলোচনা):

৩.১ মাতৃত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি:

একটি বিতর্কিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণদ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা 'মাতৃত্ব' কে নারীর ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় বা 'শৃঙ্খল' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

দার্শনিক ভিত্তি: উগ্র নারীবাদী দার্শনিক শুলমিথ ফায়ারস্টোন *(Shulamith Firestone)* তার *'The Dialectic of Sex'* গ্রন্থে দাবি করেন যে, প্রকৃতি নারীর ওপর মাতৃত্বের যে ভার চাপিয়ে দিয়েছে, তা আসলে একটি জৈবিক অত্যাচার। তাঁর মতে, যতদিন পর্যন্ত নারী গর্ভধারণ ও সন্তান লালন-পালনের এই 'প্রাকৃতিক দাসত্ব' থেকে মুক্তি না পাবে, ততদিন সে পুরুষের সমান হতে পারবে না।

এই চিন্তাধারার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে নারীরা সন্তান জন্মদানকে ভয় পেতে শুরু করে। মাতৃত্বের যে মহিমা ও পবিত্রতা ধর্ম এবং সমাজ দিয়ে আসছিল, তাকে 'পিতৃতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র' হিসেবে প্রচার করা হয়। এর ফলে গত কয়েক দশকে ইউরোপে জন্মহার। আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

রেফারেন্স: বিহাইন্ড ফেমিনিজম – মারিয়াম তানহা।

৩.২ গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণ *(Roe v. Wade*-এর প্রভাব):

১৯৭৩ সালের বিখ্যাত *'Roe v. Wade'* মামলাটি ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য আইনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই রায়ের মাধ্যমে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট নারীর প্রজনন স্বাধীনতার নামে গর্ভপাতকে বৈধতা দেয়।

শরীরের ওপর সার্বভৌমত্ব: নারীবাদীদের স্লোগান ছিল— *"My Body, My Choice"* (আমার শরীর, আমার পছন্দ)স্লোগান নিয়ে গর্ভপাত বৈধ করার জোরালো দাবি তোলে।। তারা দাবি করে যে, জরায়ুর ভেতরে থাকা ভ্রূণের জীবনের চেয়ে মায়ের ইচ্ছার মূল্য বেশি। এটি মূলত ধর্মীয় বিধানের (যেখানে ভ্রূণকে একটি জীবন মনে করা হয়) ওপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা।নারীবাদীরা একে 'মুক্তি' বললেও এটি পারিবারিক নৈতিকতায় বড় আঘাত হানে।

বিপর্যয় : এই রায়ের পর বিশ্বজুড়ে গর্ভপাত একটি ইন্ডাস্ট্রি হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে নৈতিক অবক্ষয় যেমন বেড়েছে, তেমনি নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেরও চরম অবনতি ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে এটি অবাধ যৌনাচারের এক আইনি রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রেফারেন্স: ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা – বার্নার্ড লুইস,
পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম জাস্টিস তকী উসমানী

৩.৩ গৃহস্থালি শ্রমের বোঝা ও 'গৃহবধূ' জীবনের বিরোধিতা:

এখানে বেটি ফ্রাইডান (*Betty Friedan)* এবং তার বিখ্যাত বই 'দ্য ফেমিনিন মিস্টিক' *(The Feminine Mystique)*-এর প্রসঙ্গ টানা হয়েছে।

মূল কথা: নারীবাদীরা দাবি করেন, ঘরের কাজ (রান্না, পরিষ্কার করা, সন্তান লালন-পালন) কোনো পারিশ্রমিক বা স্বীকৃতি পায় না বলে একে 'অদৃশ্য শোষণ' বলা হয়।

বন্দিশালা কেন? ফ্রাইডান মধ্যবিত্ত আমেরিকান নারীদের একঘেয়ে ও উদ্দেশ্যহীন জীবনকে বোঝাতে তাঁর বইয়ে ঘরকে 'আরামদায়ক বন্দিশালা' *(Comfortable Concentration Camp)* হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, বৈষয়িক সুখ থাকলেও নারীরা ঘরের চার দেয়ালে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলছিলেন।

৩.৪ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও বৈষম্য:

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের একটি বড় সাফল্য ছিল কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা।নারীরা বাইরে কাজ করতে গিয়ে যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল, সে বিষয়ে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক আওয়াজ এই তরঙ্গে তোলা হয়।এর আগে নারীদের বেতন কম হওয়া বা পদোন্নতিতে বাধা দেওয়াকে স্বাভাবিক মনে করা হতো। এই আন্দোলনের ফলেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবাদ শুরু হয়। **১৯৮০**-এর দশকে প্রথম 'যৌন

হয়রানি' বা *Sexual Harassment*-কে আইনিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা আগে অনেক ক্ষেত্রেই এড়িয়ে যাওয়া হতো।

৩.৫ 'জেন্ডার' ও 'সেক্স'-এর মধ্যকার পার্থক্য তৈরি:

সেক্স (***Sex***): এটি মানুষের জৈবিক পরিচয় (নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম নেওয়া)।
জেন্ডার (***Gender***): এটি সমাজ কর্তৃক আরোপিত পরিচয় (যেমন: "মেয়েদের শান্ত হতে হবে" বা "ছেলেরা কাঁদবে না")।

দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্যতম বিতর্কিত উদ্ভাবন হলো নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে অস্বীকার করা।এই মতবাদ অনুযায়ী , নারীবাদীরা দাবি করে যে, নারী বা পুরুষের চারিত্রিক পার্থক্যগুলো প্রকৃতিপ্রদত্ত নয়, বরং সমাজ আমাদের ছোটবেলা থেকে শিখিয়ে বড় করে।

রেফারেন্স: ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা বার্নার্ড লুইস, পৃষ্ঠা ৫২-৫৫।

৪. দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্যতম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ; মিস আমেরিকা প্রতিবাদ ও 'ব্রা-বার্নিং' (১৯৬৮) :

১৯৬৮ সালে আটলান্টিক সিটিতে আয়োজিত 'মিস আমেরিকা' সুন্দরী প্রতিযোগিতার বাইরে প্রায় ৪০০ নারী এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করে। তারা দাবি করে যে, এই ধরণের প্রতিযোগিতা নারীকে 'গবাদি পশু'র মতো প্রদর্শন করে।

Freedom Trash Can:

তারা একটি ডাস্টবিনে হাই হিল জুতো, লিপস্টিক, মেকআপ বক্স এবং 'ব্রা' ফেলে 'ব্রা' ফেলে দিয়ে সেটিকে *'Freedom Trash Can'* হিসেবে ঘোষণা করে। যদিও ইতিহাসে একে 'ব্রা-বার্নিং' বলা হয়,কিন্তু আসলে তারা সেখানে আগুন দেয়নি। তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, সৌন্দর্যের এই উপকরণগুলো আসলে নারীর জন্য শিকল । তারা দাবি করে, সমাজ নারীকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে মূলত একটি শৌখিন পুতুলে পরিণত করেছে। এই ঘটনাটি বিশ্বজুড়ে নারীবাদের উগ্র ধারাটিকে প্রচার করে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে 'উগ্র নারীবাদের' (*Radical Feminism*) সূচনা হয়।

৫. সামাজিক প্রভাব ও বৈশ্বিক সংকট :

দ্বিতীয় তরঙ্গের ফলে পাশ্চাত্য সমাজে কিছু ভয়াবহ পরিবর্তন আসে:

পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন:

নারীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ায় পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু মা হারিয়ে যায়। এতে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।মা বাইরে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় শিশুরা পারিবারিক শিক্ষা ও আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে।

'সিঙ্গেল মাদার'এবং একাকীত্ব:

নারীবাদের প্রভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বেড়ে যাওয়ায় ডিভোর্সের হার বহুগুণ বেড়ে যায় এবং 'সিঙ্গেল মাদার' বা একাকী মায়ের ধারণা জন্ম নেয়। এ কারণে বৃদ্ধ বয়সে নারীদের একাকীত্বের মতো চ্যালেঞ্জগুলো সামনে আসছে। মাতৃত্ব ও পরিবারকে অস্বীকার করার ফলে বর্তমানে পাশ্চাত্যের লক্ষ লক্ষ বয়স্ক নারী অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও শোচনীয় জীবন কাটাচ্ছেন।

পাঠ ২.৪: নারীবাদের তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গ (উত্তর-আধুনিকতা ও ডিজিটাল নারীবাদ)

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে নারীবাদের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে, যা 'নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ' হিসেবে পরিচিত। এই পর্যায়টি মূলত দ্বিতীয় তরঙ্গের সেই সীমাবদ্ধতাগুলোর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া ছিল, যেখানে কেবল শ্বেতাঙ্গ এবং মধ্যবিত্ত নারীদের সমস্যাগুলোকেই মূলধারা হিসেবে দেখা হতো। এই পর্যায়ের নারীবাদ উত্তর-আধুনিক দর্শনের (*Post-modernism*) ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা দাবি করেন যে, নারীর কোনো একক বা ধ্রুব পরিচয় নেই, বরং প্রতিটি নারীর অভিজ্ঞতা তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। উত্তর-আধুনিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা এই আন্দোলনটি কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ না থেকে বরং বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয়।

১. নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ (*Third Wave:* ১৯৯০-২০১০)

তৃতীয় তরঙ্গের মূল বৈশিষ্ট্য হলো 'বৈচিত্র্য' এবং 'ব্যক্তিবাদ'। দ্বিতীয় তরঙ্গে নারীদের জন্য একটি 'একক পরিচয়' খোঁজা হতো, কিন্তু তৃতীয় তরঙ্গ সেই ধারণা ভেঙে দেয়। এই তরঙ্গে নারীবাদীরা দাবি করেন যে, নারীর কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিচয় নেই;

প্রতিটি নারীর পছন্দ ও জীবনধারা আলাদা হতে পারে। এখানে নারীবাদকে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে নয়, বরং একটি ব্যক্তিগত জীবনধারা হিসেবে দেখা হয়।

- **ইন্টারসেকশনালিটি (*Intersectionality*)বা আন্তঃবিভাগীয়তা:**

এই ধারণার প্রবর্তক কিম্বার্ল ক্রেনশ (*Kimberlé Crenshaw*)। ক্রেনশ যুক্তি দেখান যে, একজন নারীর নিপীড়নের ধরণ কেবল তার লিঙ্গ দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নারী যে ধরনের বর্ণবাদ,বিদ্বেষ এবং লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন, তা একজন শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান নারীর অভিজ্ঞতার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ-এই সবগুলো অনুষঙ্গ মিলেই একজন নারীর প্রকৃত পরিচয় এবং তার সংকটের মাত্রা নির্ধারিত হয়।
রেফারেন্স: বিহাইন্ড ফেমিনিজম মারিয়াম তানহা, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৭।

- **উত্তর-আধুনিকতা ও নারীত্বের বিনির্মাণ:**

একই সময়ে লিঙ্গ বা জেন্ডারের চিরাচরিত ধারণাকে আমূল বদলে দেন দার্শনিক জুডিথ বাটলার (*Judith Butler*)। তিনি তাঁর দর্শনে দাবি করেন যে, নারী বা পুরুষ হওয়া কোনো প্রাকৃতিক বা জন্মগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি 'পারফরমেটিভিটি' (*Performativity*) বা সামাজিক অভিনয়। সমাজ আমাদের ওপর নির্দিষ্ট কিছু আচরণের ছাঁচ চাপিয়ে দেয় এবং আমরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে নারী বা পুরুষ হিসেবে পরিচিতি পাই। বাটলারের এই 'জেন্ডার কনস্ট্রাকশন' বা বিনির্মাণ তত্ত্বটি পরবর্তীকালে লিঙ্গ পরিবর্তনের আন্দোলন এবং জেন্ডার ফ্লুইডিটির তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

- **সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ ও 'রায়ট গ্রিল' (*Riot Grrrl)* আন্দোলন:**

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তৃতীয় তরঙ্গের এক বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যা 'রায়ট গ্রিল' (*Riot Grrrl*) আন্দোলনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। নব্বইয়ের দশকে নারীরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য প্রথাগত রাজনীতির বাইরে শিল্প ও সংস্কৃতিকে বেছে নেন।মিউজিক (বিশেষ করে পাঙ্ক-রক), আর্ট এবং জিনের (*Zines*) মাধ্যমে তারা

সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।এটি ছিল মূলত নারীবাদকে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি 'কুল' বা আকর্ষণীয় জীবনধারা হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা।তারা দাবি করে যে, নারীবাদ কেবল গুরুগম্ভীর রাজনীতি নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র জীবনধারা।

এই আন্দোলনের ফলে নারীবাদ তাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে এসে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি আধুনিক ও বিদ্রোহী রূপ লাভ করে। এভাবে তৃতীয় তরঙ্গ নারীবাদকে একটি বহুত্ববাদী এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে সামষ্টিক দাবির চেয়ে ব্যক্তিগত অধিকার ও বৈচিত্র্যই মুখ্য হয়ে ওঠে।

সারকথা: তৃতীয় তরঙ্গ মূলত নারীবাদকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক (*Inclusive*) করার চেষ্টা করেছে, যেখানে প্রতিটি নারীর আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা ও পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সংকট:

তৃতীয় তরঙ্গের সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি হয় এর 'উত্তর-আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যখন দাবি করা হলো যে 'নারী' বা 'পুরুষ' হিসেবে কোনো ধ্রুব সত্য বা নির্দিষ্ট সত্তা নেই এবং জেন্ডার কেবল একটি সামাজিক অভিনয় বা 'পারফরমেটিভিটি', তখন আন্দোলনের মূল ভিত্তিটিই প্রশ্নের মুখে পড়ে। যদি 'নারী' হিসেবে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিচয়ই না থাকে, তবে কাদের অধিকারের জন্য এই আন্দোলন-এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়। চরম ব্যক্তিবাদ এবং বৈচিত্র্যের ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে নারীরা আর একটি সম্মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারছিল না। এর ফলে নারীবাদের রাজনৈতিক শক্তি অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে এবং এটি কেবল কিছু সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। জাস্টিস তকী উসমানী তাঁর 'পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই স্তরে নারীবাদের লক্ষ্য অধিকার আদায়ের চেয়েও বেশি প্রথাগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে অস্বীকার করার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিশৃঙ্খলার পথ তৈরি করে।,

২. নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ (*Fourth Wave*: ২০১০-বর্তমান):

২০১০ সালের পর থেকে নারীবাদের যে নতুন পর্যায়টি বিশ্বজুড়ে বিকশিত হয়েছে, তাকেই মূলত 'নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ' বলা হয়। এই পর্যায়টি পূর্ববর্তী তরঙ্গগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ এর মূল ভিত্তি হলো ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া। এ কারণেই এই তরঙ্গকে অনেকে 'ডিজিটাল নারীবাদ' হিসেবেও অভিহিত করেন। যেখানে আগের আন্দোলনে রাজপথের মিছিল বা তত্ত্বীয় লিখনী প্রধান ছিল, সেখানে চতুর্থ তরঙ্গে হ্যাশট্যাগ (#) এবং ভাইরাল ক্যাম্পেইন হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের প্রধান হাতিয়ার। এই আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের অধিকার ও হয়রানির কথা কোটি মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন।

- **হ্যাশট্যাগ অ্যাক্টিভিজম ও *#MeToo* মুভমেন্ট**:

চতুর্থ তরঙ্গের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সোশ্যাল মিডিয়া। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া *#MeToo* আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে নারীরা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সরব হয়। এটি হলিউড থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে চিন্তার সুযোগ তৈরি করে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সাথে ঘটে যাওয়া যৌন হয়রানি নিয়ে তারা যে নিরবতা ভেঙেছেন, তা কেবল ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল না; বরং এটি বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি নতুন আইনি ও সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এই তরঙ্গ নারীকে শিখিয়েছে যে, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে থেকেও কেউ দায়মুক্ত নয়।

- **বডি পজিটিভিটি (*Body Positivity*):**

চতুর্থ তরঙ্গে 'বডি পজিটিভিটি' (*Body Positivity*) ধারণাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখানে সৌন্দর্যের প্রচলিত ও কৃত্রিম মাপকাঠিগুলোকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। গায়ের রঙ, ওজন বা শারীরিক গঠন যাই হোক না কেন-নারী নিজেকে সেভাবেই ভালোবাসবে এবং গ্রহণ করবে, এটাই এই প্রচারের মূল লক্ষ্য।

- **'ক্যানসেল কালচার' ও অনলাইন ট্রলিং:**

চতুর্থ তরঙ্গের একটি শক্তিশালী এবং একই সাথে বিতর্কিত দিক হলো 'ক্যানসেল কালচার' (*Cancel Culture*) ও অনলাইন ট্রোলিং। যখনই কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নারীবাদের পরিপন্থী কোনো মন্তব্য বা আচরণ করে, তখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা সম্মিলিতভাবে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট বা বয়কটের ডাক দেন। একে ডিজিটাল বিচারব্যবস্থা হিসেবে দেখা হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়েও বর্তমানে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। আধুনিক এই নারীবাদ কেবল রাজনৈতিক অধিকার নয়, বরং এটি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নারীর দৈনন্দিন জীবনধারা ও আত্মমর্যাদার এক নতুন লড়াই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রেফারেন্স: বিহাইন্ড ফেমিনিজম, ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা ।

ঐতিহাসিক ঘটনা: 'উইমেন'স মার্চ' (*Women's March*, ২০১৭)

চতুর্থ তরঙ্গের একটি বড় উদাহরণ হলো ২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ নারীর রাস্তায় নেমে আসা। এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম বড় গণসমাবেশ। এটি প্রমাণ করে যে, আধুনিক নারীবাদ এখন কেবল তাত্ত্বিক বইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক শক্তি।

৩. আধুনিক নারীবাদের সংকট :

তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গে নারীবাদ যখন 'জেন্ডার' বা 'পরিচয়' নিয়ে অতিমাত্রায় বিতর্কিত পথে হাঁটে, তখন এটি খোদ নারী জাতির জন্য সংকট তৈরি করে। যখন বলা হয় "নারী হয়ে কেউ জন্মায় না", তখন নারীর স্বকীয়তা ও ফিতরাত (প্রকৃতি)
হারিয়ে যায়।

নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের সংকট:

চতুর্থ তরঙ্গের সংকটগুলো মূলত এর ডিজিটাল চরিত্রের সাথে মিশে আছে। বর্তমানে 'ক্যানসেল কালচার' (*Cancel Culture*) এই তরঙ্গের একটি অন্যতম অন্ধকার দিক। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে কোনো গঠনমূলক আলোচনা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে ধ্বংস করে দেয়। একে অনেক সমাজবিজ্ঞানী 'ডিজিটাল মবিং' হিসেবে আখ্যা

দিয়েছেন। এছাড়া, হ্যাশট্যাগ অ্যাক্টিভিজম অনেক সময় প্রকৃত পরিবর্তনের চেয়েও ভার্চুয়াল প্রচারণাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যাকে সমালোচকরা 'স্ল্যাক্টিভিজম' (*Slacktivism*) বলেন। বডি পজিটিভিটির মতো ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর বাণিজ্যিকীকরণ অনেক সময় স্বাস্থ্যের চেয়ে কেবল বাহ্যিক রূপকেই প্রাধান্য দেয়। মারিয়াম তানহা তাঁর 'বিহাইন্ড ফেমিনিজম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ডিজিটাল যুগের এই অতি-স্বাধীনতা অনেক সময় নারীর ওপর দ্বিমুখী চাপ তৈরি করে-তাকে ঘরের বাইরের সফল ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ডিজিটাল জগতেও নিজের একটি আদর্শ ইমেজ ধরে রাখতে হয়, যা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক সভ্যতা নারীকে ঘর থেকে বের করে রাস্তায় এনেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে শান্তি দেয়নি। ডিজিটাল যুগে নারী আরও বেশি প্রদর্শনী ও শোষণের শিকার হচ্ছে।

রেফারেন্স: ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৪০।

পাঠ ২.৫: নারীবাদের বিভিন্ন শাখা ও মতাদর্শিক বৈচিত্র্য (*Schools of Thought)*

নারীবাদের ভেতরে লক্ষ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র শাখা তৈরি হয়েছে। নিচে প্রধান তিনটি শাখা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. উদারপন্থী নারীবাদ (*Liberal Feminism):*

এরা বিদ্যমান সমাজ কাঠামো ও আইনের সংস্কার চায়। তাদের বিশ্বাস হলো, শিক্ষা ও আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব। মেরি ওলস্টোনক্রাফট এবং জন স্টুয়ার্ট মিল এই ধারার অগ্রপথিক। তারা চান নারী যেন পুরুষের সমান ভোটাধিকার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পায়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রচলিত আইনি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সংস্কারের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা।

উদাহরণ: নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন এবং কর্মক্ষেত্রে সমান বেতনের দাবি। মেরি ওলস্টোনক্রাফট এবং জন স্টুয়ার্ট মিল এই ধারার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

২. উগ্র নারীবাদ (*Radical Feminism*):

এদের মতে, সমস্যা আইনে নয়, বরং 'পুরুষতন্ত্রে' (*Patriarchy*)। তারা পরিবার ব্যবস্থাকে একটি শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে।এরা মনে করে সমাজ ও পরিবার নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তৈরি হয়েছে। তারা সমাজ কাঠামোকে পুরোপুরি বদলে ফেলার দাবি জানায়।শুল্লামিথ ফায়ারস্টোন-এর মতো উগ্র নারীবাদীরা দাবি করেন যে, সন্তান জন্ম দেওয়ার যে প্রাকৃতিক দায়িত্ব নারীর ওপর আছে, তা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত নারী স্বাধীন হতে পারবে না। তারা অনেক ক্ষেত্রে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' (*Separatism*) বা পুরুষহীন সমাজেরও স্বপ্ন দেখে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা
- এবং নারীর শরীর ও প্রজনন ক্ষমতার ওপর নারীর নিজস্ব

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

উদাহরণ: 'পুরুষহীন সমাজ' বা বিচ্ছিন্নতাবাদের ধারণা এবং ঘরোয়া সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন। শুলামিথ ফায়ারস্টোন এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা।

৩. মার্ক্সবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (*Marxist/Socialist Feminism*):

এরা নারী সমস্যাকে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখে। তাদের মতে, পুঁজিবাদী সমাজ নারীর ঘরোয়া শ্রমকে (রান্না, সন্তান লালন-পালন) শোষণ করে এবং নারীকে

আর্থিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। তারা দাবি করে, ঘরের কাজকে 'শ্রম' হিসেবে গণ্য করে তার মজুরি দিতে হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- এবং ঘরোয়া কাজকে 'শ্রম' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

উদাহরণ: 'গৃহকাজের জন্য মজুরি' (*Wages for Housework*) আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে নারী মুক্তির প্রচেষ্টা।

৪. সাংস্কৃতিক নারীবাদ (*Cultural Feminism):*

এই ধারাটি নারীর সহজাত গুণাবলিকে (যেমন-সহমর্মিতা, যত্ন নেওয়া, অহিংসা) গুরুত্ব দেয়। তারা মনে করেন, সমাজ বর্তমানে কেবল পুরুষের গুণগুলোকে (যেমন-আগ্রাসন, প্রতিযোগিতা) বেশি প্রাধান্য দেয়। সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা চান সমাজে নারীর এই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোর মূল্যায়ন হোক এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠিত হোক।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমাজে নারীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর(যেমন-সহমর্মিতা, অহিংসা) যথাযথ মূল্যায়ন করা
- এবং একটি 'নারী-কেন্দ্রিক' সমাজ গড়ে তোলা।

উদাহরণ: নারী-কেন্দ্রিক সাহিত্য, শিল্পকলা এবং যত্ন-ভিত্তিক সমাজসেবা মূলক কার্যক্রমের প্রসার। ক্যারল গিলিগান এই ধারার অন্যতম চিন্তাবিদ।

রেফারেন্স: কালচারাল ফেমিনিজম: দ্য স্পিরিট অফ ওমেন- বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলন।

৫. উত্তর-আধুনিক বা পোস্টমডার্ন নারীবাদ (*Postmodern Feminism*):

এই মতবাদটি নারীত্বের কোনো একটি নির্দিষ্ট বা সার্বজনীন সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে। পোস্টমডার্ন নারীবাদীরা মনে করেন যে, 'নারী' বা 'পুরুষ' হওয়া কোনো জন্মগত সত্য নয়, বরং এটি ভাষা, সমাজ এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে তৈরি একটি ধারণা মাত্র। তাদের মতে, পৃথিবীর সকল নারীর অভিজ্ঞতা এক নয়; বর্ণ, শ্রেণি বা অঞ্চলভেদে তা ভিন্ন হতে পারে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- লিঙ্গ বা জেন্ডারের প্রচলিত দ্বৈত সংজ্ঞাগুলো (নারী বনাম পুরুষ)ভেঙেফেলা
- এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নারীর বৈচিত্র্যময় পরিচয়কে স্বীকৃতি দেওয়া।

উদাহরণ: জেন্ডার পারফরমেটিভিটি তত্ত্ব-যেখানে বলা হয় আমরা পোশাক ও আচরণের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় ফুটিয়ে তুলি। জুডিথ বাটলার এই ধারার প্রধান প্রবক্তা।

রেফারেন্স: জেন্ডার ট্রাবল - জুডিথ বাটলার।

৬. পরিবেশবাদী নারীবাদ বা ইকো-ফেমিনিজম (*Eco-Feminism*):

এই মতবাদটি প্রকৃতি এবং নারীর ওপর আধিপত্যের মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র খুঁজে পায়। এদের মতে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে প্রকৃতিকে শোষণ ও সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে, ঠিক একইভাবে নারীকেও দমন ও নিয়ন্ত্রণ করে রাখে।
তারা মনে করেন, পরিবেশ রক্ষা এবং নারী মুক্তি—এই দুটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রকৃতি ও নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক শোষণ বন্ধ করা
- এবং একটি পরিবেশবান্ধব, অহিংস ও লিঙ্গ-বৈষম্যহীন টেকসই ও সংবেদনশীল পৃথিবী গড়ে তোলা।

উদাহরণ: ভারতের বিখ্যাত ‘চিপকো আন্দোলন’, যেখানে গ্রামীণ নারীরা গাছ কাটতে বাধা দিতে গাছকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। বন্দনা শিবা এবং মারিয়া মিস এই ধারার অন্যতম প্রবক্তা।
রেফারেন্স: ইকোফেমিনিজম — বন্দনা শিবা ও মারিয়া মিস।

পাঠ ২.৬: মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের অনুপ্রবেশ ও 'ইসলামী নারীবাদের' তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের অনুপ্রবেশ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে পাশ্চাত্য জীবনদর্শন মুসলিম সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করে। সরাসরি পাশ্চাত্য নারীবাদ মুসলিম কৃষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায়, আধুনিক তাত্ত্বিকরা ইসলামের ভেতর থেকেই একটি 'সংস্কারবাদী' ধারা তৈরি করেন, যা বর্তমানে 'ইসলামী নারীবাদ' (Islamic Feminism) নামে পরিচিত। এই পাঠে আমরা এই মতাদর্শের বিবর্তন এবং এর বিভিন্ন বিতর্কিত দিকগুলো আলোচনা করব।

১. অনুপ্রবেশের ঐতিহাসিক পটভূমি: কাসেম আমীন ও মিশরের আন্দোলন

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের আনুষ্ঠানিক সূচনা ধরা হয় **১৯শ** শতাব্দীর শেষের দিকে মিশরে।**১৮৯৯** সালে মিশরের কাসেম আমীন (Qasim Amin) তাঁর বিতর্কিত গ্রন্থ 'Tahrir al-Mar'a' (নারীর মুক্তি) প্রকাশ করেন। যদিও তিনি একজন মুসলিম ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত। তিনি দাবি করেন যে, হিজাব বা পর্দা মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মূল কারণ। তাঁর এই বই মিশরের আলেম সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিত একদল বুদ্ধিজীবী মনে করতে শুরু করেন যে, ইউরোপীয়দের মতো পরিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২. 'ইসলামী নারীবাদ' (Islamic Feminism) ও এর তাত্ত্বিক ভিত্তি

এটি এমন এক মতাদর্শ যা দাবি করে যে, ইসলাম ও নারীবাদ পরস্পরবিরোধী নয়। তারা কুরআন ও সুন্নাহর প্রচলিত ব্যাখ্যাকে 'পুরুষতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে নতুনভাবে পাঠ (Re-reading) করার দাবি তোলে।

হাদাসাহ বা আধুনিকতাবাদ:

তারা 'হেরমেনিউটিকস' নামক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ব ব্যবহার করে দাবি করে যে, কুরআনের বিধানগুলো সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, ৭ম শতাব্দীতে নারীর উত্তরাধিকার বা সাক্ষ্য প্রদানের যে নিয়ম ছিল, ২১শ শতাব্দীতে তা কার্যকর থাকা যৌক্তিক নয়।

৩. প্রধান প্রবক্তা ও বিতর্কিত ঘটনাপ্রবাহ

ইসলামী নারীবাদের প্রসারে বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিকের ভূমিকা অত্যন্ত বিতর্কিত ও আলোচিত:

ফাতেমা মেরনিসি (Fatema Mernissi): হাদীস শাস্ত্রের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ মরক্কোর সমাজবিজ্ঞানী ফাতেমা মেরনিসি (১৯৪০-২০১৫) ইসলামী নারীবাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁর আলোচিত গ্রন্থ 'The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam' (১৯৮৭)-এ সে অত্যন্ত বিতর্কিত কিছু দাবি তোলেন। মেরনিসি দাবি করেন যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস (বিশেষ করে নারীর নেতৃত্ব সংক্রান্ত) রাজনৈতিক স্বার্থে প্রভাবশালী পুরুষরা তৈরি করেছেন। তিনি সহীহ বুখারীর সেই বিখ্যাত হাদীসটি- "।"-এর কট্টর সমালোচনা করেন।

তিনি উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু বাকরা (রা.)-এর ব্যক্তিগত সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাদীসটিকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁর এই পদ্ধতিটি মুহাদ্দিসীনদের সুপ্রতিষ্ঠিত 'উসূলে হাদীস' বা হাদীস বিজ্ঞানের মূলনীতিকে সরাসরি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে।মেরনিসির এই কাজ মূলত মুসলিম মানসে হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট করার একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ।

আমিনা ওয়াদুদ (Amina Wadud):

আমিনা ওয়াদুদ একজন আমেরিকান মুসলিম তাত্ত্বিক, যার গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো কুরআনের তথাকথিত 'নারী-বান্ধব' অপব্যাখ্যা প্রদান।

লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তাফসীর (Gender-Neutral Exegesis): তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Qu'ran and Woman' (১৯৯২)-এ তিনি দাবি করেন, কুরআনের ভাষা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, কিন্তু পুরুষ মুফাসসিররা তাদের পূর্বসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে এর অপব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উত্তরাধিকার ও পর্দার আয়াতগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে (Contextual) ফেলে আজ সেগুলোকে প্রায় অকার্যকর প্রমাণের চেষ্টা করেন।
বিতর্কিত ইমামতি (২০০৫): ১৮ মার্চ ২০০৫ সালে নিউইয়র্কের সেন্ট জন দ্য ডিভাইন ক্যাথেড্রালে আমিনা ওয়াদুদ প্রথম নারী হিসেবে পুরুষদের একটি বড় জামাতে জুমার নামাযের ইমামতি করেন। এই ঘটনাটি ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামী শরীয়াহর সুপ্রতিষ্ঠিত 'ইজমা' বা ঐকমত্যের ওপর একটি প্রকাশ্য আঘাত। শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী পুরুষের ইমামতি কেবল পুরুষই করতে পারে, কিন্তু তিনি লিঙ্গ-সমতার দোহাই দিয়ে এই বিধান লঙ্ঘন করেন। এটি মুসলিম সমাজে আমূল পরিবর্তনের একটি প্রতীকী আন্দোলন ছিল।

আসমা বারলাস (Asma Barlas): পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত আমেরিকান অধ্যাপক আসমা বারলাস তাঁর 'Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an' গ্রন্থের জন্য পরিচিত। তিনি দাবি করেন যে, কুরআন একটি 'নন-প্যাট্রিয়ার্কাল' (অ-পুরুষতান্ত্রিক) ঐশী গ্রন্থ। তাঁর মতে, যেহেতু মহান আল্লাহ লিঙ্গাতীত (লিঙ্গহীন), তাই তাঁর কালাম কোনো বিশেষ লিঙ্গের পক্ষ নিতে পারে না। কিন্তু গত চৌদ্দশ বছরের পুরুষ মুফাসসিররা তাদের নিজস্ব আধিপত্য বজায় রাখতে কুরআনকে পুরুষের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন।
তাফসীরের নতুন পদ্ধতি: বারলাস প্রথাগত তাফসীর পদ্ধতিকে অস্বীকার করে 'ব্যক্তিগত পাঠ' বা 'Hermeneutics' পদ্ধতির ওপর জোর দেন, যা মূলত কুরআনের চিরস্থায়ী ও শাশ্বত অর্থকে যার যার খেয়াল-খুশিমতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দেয়। এই প্রবক্তাদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামের প্রতিষ্ঠিত উসুল বা মূলনীতিসমূহকে ভেঙে ফেলা। তারা 'নারীর মুক্তি'র নাম দিয়ে আসলে মুসলিম নারীর ঈমানী ভিত্তি ও শরয়ী আনুগত্যের কাঠামোটিকেই পরিবর্তন করতে চান।

৪. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সিডিও (CEDAW) সনদের ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের অনুপ্রবেশ কেবল তাত্ত্বিক বইয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং একে আন্তর্জাতিক আইনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিডিও (CEDAW) সনদ: ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এই সনদটি মুসলিম দেশগুলোকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। এই সনদের ২ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ধারা সরাসরি ইসলামী পারিবারিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ সেখানে বিবাহ, তালাক এবং সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের 'পূর্ণ সমতা'র (Absolute Equality) দাবি করা হয়েছে।

এনজিও (NGO)-র প্রভাব: মুসলিম দেশগুলোতে কার্যরত অনেক এনজিও গ্রামের সাধারণ মুসলিম নারীদের মাঝে এই ধারণা প্রচার করে যে, পর্দা বা পারিবারিক আনুগত্য হলো তাদের পশ্চাদপদতার কারণ।

৫. পরিবার কাঠামোর ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আঘাত

ইসলামী নারীবাদীরা মুসলিম পরিবারের শান্তি ধ্বংস করতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে:

নেতৃত্বের সংকট: তারা 'কাওয়াম' বা পারিবারিক অভিভাবকত্বের ধারণাকে সরাসরি অস্বীকার করে। তাদের মতে, পরিবারে কেউ কারো অভিভাবক নয়, বরং এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালিত হওয়া উচিত।

তালাক ও খোরপোশ: তারা দাবি করে যে, তালাকের ক্ষমতা এককভাবে স্বামীর হাতে থাকা বৈষম্যমূলক এবং বিচ্ছেদের পরও স্বামীকে আমৃত্যু স্ত্রীর খোরপোশ বহন করতে হবে (যা শারঈ খোরপোশের পরিপন্থী)।

৬. মুসলিম তরুণ প্রজন্মের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

আধুনিক মিডিয়া ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম তরুণীরা এক ধরণের 'আদর্শিক দ্বন্দ্বে' (Identity Crisis) ভুগছে।

উদাহরণ: বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক মুসলিম ইনফ্লুয়েন্সার 'ইসলামী নারীবাদের' ছদ্মবেশে হিজাবকে স্রেফ একটি ফ্যাশন হিসেবে প্রচার করছে এবং শারঈ পর্দার মূল

চেতনাকে অবমূল্যায়ন করছে। তারা 'অধিকারের' দোহাই দিয়ে মুসলিম নারীর হায়া ও নৈতিক ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে।
–(ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার)

'ইসলামী নারীবাদ' কোনো ধর্মীয় সংস্কার নয়, বরং এটি ইসলামকে ভেতর থেকে পাশ্চাত্য উদারনৈতিক দর্শনের সাথে একীভূত করার একটি অপপ্রয়াস। এটি নারীর প্রকৃত মুক্তি নয়, বরং তাকে তার শেকড় ও আত্মপরিচয় থেকে বিচ্যুত করার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ।

পাঠ ২.৭: “নারীবাদের অসারতা: সামগ্রিক পর্যালোচনা”

নারীবাদের দীর্ঘ বিবর্তন, এর বিভিন্ন তরঙ্গ এবং এর অন্তরালে থাকা বৈশ্বিক এজেন্ডাগুলো বিশ্লেষণের পর এটি স্পষ্ট যে, এই মতবাদটি নারীর সামগ্রিক মুক্তির পরিবর্তে নতুন এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকটের জন্ম দিয়েছে। একাডেমিক গবেষণার আলোকে নারীবাদের অসারতার প্রধান দিকগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি বা 'ফিতরাত' এর সাথে সংঘাত

নারীবাদের অন্যতম বড় অসারতা হলো এটি নারী ও পুরুষের মধ্যকার সৃষ্টিগত ও জৈবিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে। নারীবাদীরা দাবি করেন যে, নারী ও পুরুষের পার্থক্য কেবল সমাজসৃষ্ট। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রমাণ করে যে, নারী ও পুরুষের শারীরিক কাঠামো, হরমোন এবং মনস্তাত্ত্বিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন।: এই সৃষ্টিগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে নারীকে পুরুষের সমান্তরাল হাড়ভাঙা খাটুনিতে বাধ্য করার ফলে নারীরা বর্তমানে চরম শারীরিক ও মানসিক অবসাদ বা 'Burnout' সিনড্রোমে ভুগছে। এটি মূলত প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক নিষ্ফল যুদ্ধ।

২. নারীর আত্মমর্যাদা ও 'হায়া'র বিনাশ

নারীবাদ দাবি করেছিল তারা নারীকে পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু বাস্তবে তারা নারীকে কর্পোরেট জগতের দাসে পরিণত করেছে।

মর্যাদার অবক্ষয়: স্বাধীনতার নামে নারীর শরীরকে পণ্যের বিজ্ঞাপনে প্রদর্শন করা হচ্ছে। জাস্টিস তকী উসমানী তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীর শরীর থেকে লজ্জা বা হায়ার আবরণ কেড়ে নিয়ে তাকে বাজারে উন্মুক্ত করেছে।
পুরুষতন্ত্রের যে শৃঙ্খল থেকে নারীবাদ মুক্ত হতে চেয়েছিল, বর্তমানে তারা তার চেয়েও ভয়ংকর 'পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের' হাতে জিম্মি, যেখানে নারীর সৌন্দর্যই তার একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. পরিবার ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও সামাজিক অস্থিরতা

পরিবার হলো একটি সমাজের কোষ বা ক্ষুদ্রতম ইউনিট। নারীবাদ এই ইউনিটের ওপরই সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে।
মাতৃত্বের অবমূল্যায়ন: নারীবাদী দর্শনে মাতৃত্বকে একটি 'বোঝা' বা 'অভিশাপ' হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এর ফলে পাশ্চাত্য সমাজে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।
শিশুর অধিকার ক্ষুণ্ণ: মা ও বাবা উভয়েই ক্যারিয়ারের পেছনে অন্ধভাবে দৌড়ানোর ফলে শিশুরা পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা ও মাতৃত্বের পরম মমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার সরাসরি ফলাফল হলো বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান কিশোর অপরাধ ও কিশোর গ্যাং কালচার।
নিঃসঙ্গতা: পরিবার ভাঙার ফলে মানুষ আজ চরম একা। পাশ্চাত্যের 'ওল্ড হোম' সংস্কৃতি এবং একাকীত্বের মহামারি নারীবাদের এই অসারতারই করুণ পরিণতি।

৪. পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে নারীর অবস্থান (Gender Conflict)

নারীবাদ নারী ও পুরুষের মধ্যকার 'পরিপূরকতা'র (Complementarity) চিরন্তন সম্পর্ককে নষ্ট করে 'প্রতিযোগিতা' ও 'প্রতিপক্ষতা'র (Confrontation) সম্পর্ক তৈরি করেছে।তারা পুরুষকে নারীর আজন্ম শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যা দম্পতিদের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করেছে। এই লিঙ্গীয় যুদ্ধ সমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পরিবর্তে এক ধরণের স্থায়ী অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

৫. সমাধানের পরিবর্তে সংকটের বিস্তার

নারীবাদের যে লক্ষ্যগুলো ছিল (যেমন: নির্যাতন বন্ধ বা সমান সুযোগ), তা অর্জনে এই মতবাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, নারীবাদের প্রসারের সাথে সাথে নারীর ওপর সহিংসতার হার কমেনি বরং জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষের তৈরি এই মতবাদটি সমস্যার মূল শিকড় উপড়াতেঅক্ষম।

অধ্যায় সারসংক্ষেপ (Chapter Conclusion):

উপরিউক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নারীবাদ হলো একটি 'মরীচিকা'। এটি নারীকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে আসলে এক আধুনিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। এটি কেবল পারিবারিক শান্তি কেড়ে নেয়নি, বরং নারীর আত্মিক প্রশান্তিকেও ধূলিসাৎ করেছে। সুতরাং, মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং নারীর প্রকৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য নারীবাদের এই ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের বাইরে একটি কুর'আনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধানের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য।

রেফারেন্স:

১. ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা- বার্নার্ড লুইস।

২. পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম -জাস্টিস তকী উসমানী।

৩. বিহাইন্ড ফেমিনিজম- মারিয়াম তানহা।

৪.নারী ও বাস্তবতা - শাহ আবদুল হান্নান।

৫.ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার -সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী ।

|| ৩য় অধ্যায় ||

“ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক, মানবিক ও পারিবারিক অধিকার”

পাঠ ৩.১: ইসলামের আলোকে নারী-পুরুষের সমতা ও পরিপূরকতা

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিচালনা করে। ইসলামের নিয়ম-কানুন এবং দিকনির্দেশনা মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামী জীবনদর্শনে নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদার ভিত্তি তাদের লিঙ্গ নয়, বরং তাদের 'ইনসানিয়াত' বা মানবতা। পাশ্চাত্য দর্শনে যেখানে নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, ইসলাম সেখানে তাদের 'পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই পাঠে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও সমতা বিশ্লেষণ করব।
ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারীকে 'আধ্যাত্মিক অযোগ্য' মনে করা হতো। কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর নৈকট্য ও পরকালীন জান্নাত লাভের ক্ষেত্রে লিঙ্গ কোনো অন্তরায় নয়; বরং একমাত্র মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া' বা নেক আমল।

১. মূল কুরআনী দলীল: এক উৎস থেকে সৃষ্টি

পৃথিবীতে নারী পুরুষের সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী-পুরুষের একত্ব সম্পর্কে কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী আসলে কোন স্বতন্ত্র জীবসত্তা নয়। নারীও পুরুষের মত মানুষ। যেমন মানুষ হচ্ছে এ পুরুষরা। নারী একই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ধারার বিকাশে সাধিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَـٰٓأَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا
لًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি (আদম আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া (হাওয়া আঃ))সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন ।
—("সূরা নিসা" ৪:১)

আয়াতের ব্যাখ্যা : আরবের জাহেলী সমাজ এবং তৎকালীন বিশ্বের অনেক ভ্রান্ত দর্শনে মনে করা হতো যে, নারী কোনো হীন বা অপবিত্র উৎস থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা 'নাফসিন ওয়াহিদা' (একই প্রাণ বা সত্তা) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই বৈষম্যের মূলে আঘাত করেছেন।এখানে 'নাফসিন ওয়াহিদা' (এক ব্যক্তি) বলতে হযরত আদম (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের আদি উপাদান বা উৎস এক। তারা আলাদা কোনো প্রজাতির জীব নয়। হাওয়া (আ.)-কে আদম (আ.) থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে নারী ও পুরুষ শরীরের দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশের মতো।সুতরাং বংশগত বা সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের ওপর নারীর কোনো হীনম্মন্যতা থাকার অবকাশ নেই। যেহেতু উৎস এক, তাই মর্যাদাও সমান। এখানে লিঙ্গীয় শ্রেষ্ঠত্বের কোনো স্থান নেই।
কুরআন কারীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يَاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ۚاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰىكُمْ ۚاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।" –(সুরা আল হুজরাত:১৩)

পুরুষের মধ্যে যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, নারীর মধ্যেও তাই রয়েছে । দুনিয়ার সব মানুষ (নর-নারী), সকল কালের, সকল দেশের, সকল জাতের ও সকল বংশের মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি । এক আল্লাহর সৃষ্টি বলে কোন মানুষ (নর-নারী) অর্থাৎ নর-নারীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা যায় না। দুনিয়ার সব মানুষই একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌন মিলনের ফল হিসেবে সৃষ্ট। দুনিয়ার একমাত্র হযরত ঈসা (আ)

ছাড়া এমন কোন পুরুষ নেই, যার সৃষ্টি ও জন্মের ব্যাপারে কোন নরের প্রত্যক্ষ দান নেই কিংবা এমন কোন নারী নেই, যার জন্মের ব্যাপারে কোন পুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ অনুপস্থিত। আবার এমন কোন নারী-পুরুষ নেই, যাদের জন্মের ব্যাপারে নারীর কোন প্রত্যক্ষ অবদান নেই। এ কারণেই নারী-পুরুষ কেউ কারোর ওপর কোন মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউই অপর কাউকে জন্মগত কারণে হীন, নীচ, নগণ্য ও ক্ষুদ্র বলে ঘৃণাও করতে পারে না। মানব দেহের সংগঠন পুরুষের সাথে নারীরও যথেষ্ট অংশ শামিল রয়েছে।

কুরআন কারীমে আরো আয়াত রয়েছে যেগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হবে যে, নারী এবং পুরুষ আসলে এক ও অভিন্ন। শারীরিক গঠনে সামান্য ভিন্ন থাকলে মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, ইচ্ছাবোধ, মানবতাবোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৃষ্টিভংগি, প্রজ্ঞা, বিবেক, ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।

নারী-পুরুষের এ অভিন্নতা সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ

"নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর হোক নারীই, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে আসলে এক অভিন্ন" –(সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৯৫)

নারী পুরুষ যে সর্ববিধ থেকে সমান, প্রত্যেকেরই যে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা, সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্যে একান্তই অপরিহার্য এবং কেউ কাউকে ছাড়া নয় বা হতে পারে না, তা স্পষ্টভাবে এ ধরনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে কুরআন কারীমে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের যে ব্যবধান রয়েছে তার ভিত্তি মূলত দু'টি। একটি হল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে, দ্বিতীয়টি হল তাকওয়ার ভিত্তিতে। এছাড়া মানুষ হিসেবে নর-নারীর মর্যাদা, সম্মান, ইজ্জত ও অধিকারকে পার্থক্য করা হয়নি ।

জন্মগত সমতা :

ইসলামে জন্মগত কারণে নারী-আর পুরুষের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদার সুব্যবস্থা রাখা হয়নি। মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাই পুত্র সন্তান হলে খুশীতে আটখান, আর কন্যা সন্তান হলে মুখ বিষাদের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তা ইসলাম গ্রাহ্য করে না। সুতরাং এ সৃষ্টিগত কারণে পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের সমতা করা হয়েছে মর্যাদা, অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে।

কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَا لْاَ رْضِ ۗيَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَا ثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَا نًا وَّاِنَا ثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗاِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

"আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন। অথবা করেন- পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি কন্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

–(সূরা আশ্ শূরা: ৪৯-৫০)

সন্তান হিসেবে কন্যা বা ছেলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অধিকারের সমতা :

وَا للّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَا جِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗاَفَبِا لْبَا طِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

"আল্লাহ তোমাদের স্বজাতির মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন আর তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযক দিয়েছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বাতিল জিনিসের উপর ঈমান পোষণ করবে আর আল্লাহর অনুগ্রহকে তারা অস্বীকার করবে?"

–(আন্ নাহল ১৬: ৭২)

মহান আল্লাহর কাছে সত্যবাদী নারী ও পুরুষ সমান। তিনি কাউকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না বা মূল্যায়ন করেন না। তাই তিনি নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন। প্রেম, ভালোবাসা ও পবিত্রতা রক্ষায় নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করা হয়েছে।

ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সমতা :

পুরুষের ন্যায় একজন নারীকেও কালেমা বিশ্বাসের মাধ্যমে তার ঈমান ও আমলকে সুসংহত করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঈমানের আরকান হল সাতটি। তাওহীদে বিশ্বাসের পরেই বাকী ৬টির প্রতি ঈমান আনাও নারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِا للهِ وَا لْيَوْمِ الْاٰ خِرِ وَا لْمَلٰٓئِكَةِ وَا لْكِتٰبِ وَا لنَّبِيّنَ ۚوَا تَى الْمَا لَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَا لْيَتٰمٰى وَا لْمَسٰكِيْنَ وَا بْنَ السَّبِيْلِ ۙوَا لسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَا بِ ۚوَاَ قَا مَ الصَّلٰوةَ وَاٰ تَى الزَّكٰوةَ ۚوَا لْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚوَا لصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَا لضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُ ولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞ্চাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী।" –(সূরা আল বাকারাহ ২:১৭৭)

সুতরাং ঈমান আনয়নের পরই নারীকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এছাড়া প্রতিটি নারীকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে, চাকর-চাকরাণিদের সাথে, শিশুদের সাথে, বড়দের সাথে ইসলামের আলোকে আচরণ ও তাদের অধিকার আদায় করতে হয়। এভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান নরের

ন্যায় নারীও পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশীল, কল্যাণময়ী জীবন গঠন করার তাগিদ কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয়েছে। নারী নারীর জন্য, আবার পুরুষ পুরুষের জন্য- এ দৃষ্টিভংগিতে কেউ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবে না; আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। ঈমানের পরই ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন তথা আমলের মাধ্যমে নারীও অনেক সময় নরকে পেছনে ফেলে আল্লাহর নৈকট্য সহজেই অর্জন করতে পারে। আল্লাহর কাছে তাকওয়াই বড় বিষয়, নর বা নারী নয়।

কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ
ۙ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَا لْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

"অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যাঁর হাতে; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- ‘আমালের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি (একদিকে যেমন) মহা শক্তিধর, (আবার অন্যদিকে) অতি ক্ষমাশীল।"

(সূরা আল মূলক,৬৭:১-২)

এভাবে ঈমান ও বিশ্বাসের দিকে নর-নারীকে অধিকার সমান রেখেছেন।

ইবাদতের ক্ষেত্রে সমতা :

সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানব সমাজের প্রতি সুন্দর জীবন গঠনের নির্দেশ জারী করেছেন

। সূরা যারিয়ার ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لْاِ نْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।" –(সূরা যারিয়া ৫১:৫৬)

এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নর-নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কোন পুরুষ তার ইবাদত করার অধিকারকে হরণ করতে পারে না বা এ বিষয়ে কোন বাধা দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অর্থাৎ তাদেরকে সমতার বিধানে আবদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীস শাস্ত্রের আলোকে সমতা :
রাসূলুল্লাহ (সা.) এই মানবিক সমতাকে একটি বাক্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন:

إنما النساء شقائق الرجال

"নিশ্চয়ই মহিলারা পুরুষদের অর্ধাংশ বা সহোদর তুল্য।"
–(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৩৬)

মুফতী হিফজুর রহমান তাঁর 'ইসলামে নারীর মূল্যায়ন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মানবিক মর্যাদা, আইনি অধিকার এবং সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একই মুদ্রার দুই পিঠ। ইসলামে যেখানেই 'মানুষ' হিসেবে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত (যদি না কোনো বিশেষ বিধান কেবল পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট হয়)।
–(ইসলামে নারীর মূল্যায়ন, পৃষ্ঠা ৪২)

কর্তব্যবোধের সমতা :
মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সমান। দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা হয়নি। যার যার দায়িত্ব পালনের অগ্রাধিকার সকলের সমভাবে রয়েছে। কুরআন কারীমে এ দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।"
–(সূরা আল মুদ্দাসসির ৭৪:৩৮)

এখানে পুরুষকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার জন্য তাকে দায়ী করা হবে, আর নারীকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে। নর বা নারীই হোক কারো কর্মকে আল্লাহ বিফল করেন না; বরং আল্লাহর কাছে নর ও নারী সমান।

কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

فَا سْتَجَا بَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَا مِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ
"তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোন কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না, তোমরা একে অপরের অংশ। –(সূরা আলে ইমরান ৩: ১৯৫)

নর-নারী হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমে উভয়ই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে এবং এ সুন্দর কাজের জন্য পুরস্কারও সমভাবে অর্জন করার সুযোগ ইসলামে দেয়া হয়েছে।

কুরআন কারীমে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

مَنْ عَمِلَ صَا لِحًـا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَـنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَـنَجْزِيَـنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَ حْسَنِ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ
"পুরুষ আর নারীদের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে আর সে মু'মিনও, তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই তারা যা করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিফল দান করব।"
–(সূরা আন নাহাল১৬: ৯৭)

অন্য আরেকটি আয়াত

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَا ولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَـنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে আর সে ঈমানদারও বটে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি তিল পরিমাণও অন্যায় করা হবে না।"
–(সূরা আন নিসা ৪: ১২৪)

সুতরাং দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে পুরুষকে কম, আর নারীকে বেশী দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। তবে সৃষ্টিগত কারণে পুরুষ, আর নারীর দায়িত্বের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা হয়নি। মহান আল্লাহ যে ইবাদতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন তা সুষ্ঠুভাবে পালন ও বাস্তবায়ন এবং সে মোতাবেক জীবন গঠনের ক্ষেত্রে যে অধিকার রয়েছে তা কোন পুরুষ হরণ করতে পারে না। বরং এ দায়িত্ববোধের জন্যে নর-নারী উভয়কে দায়ী করা হবে। অতএব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নর ও নারীর সমতা রয়েছে।

প্রয়োজনীয়তার সমতা :

নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তা তার চাহিদা, রুচি, দৃষ্টিভংগি, সুপ্রবৃত্তি, বিবেক, পরিবেশ প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। এসবের কারণে নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কিছুটা অমিল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু মানুষ হিসেবে কতগুলো অনিবার্য বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে। যেমন- ১. বেঁচে থাকার পরিবেশ ও উপাদান, ২. অন্ন, ৩. বস্ত্র, ৪. বাসস্থান, ৫. চিকিৎসা, ৬. শিক্ষা, ৭. ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, ৮. যৌনসুখ উপভোগ, ৯. উত্তম আচরণের বিকাশ সাধন, ১০. পারস্পরিক আচরণে সুসম্পর্ক স্থাপন, ১১. মহানুভবতা, ১২. সুপ্রবৃত্তি অর্জন, ১৩. কুপ্রবৃত্তি দমন, ১৪. ধর্মীয় অনুশাসন, ১৫. সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ১৬. বিবেক ও মেধার বিকাশ, ১৭. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, ১৮. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়াশীল। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।

নারী-পুরুষের কতিপয় মৌলিক পার্থক্য

মহান আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে নর ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হিসেবে সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাসহ সকল ইসলামী

আইন মেনে চলা; কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন এক বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যার কারণে নর নারীকে ভালোবাসে, এ বিপরীতধর্মী নর ও নারীর বৈশিষ্ট্যের কারণে বা অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে শারীরিক তারতম্য, রুচির তারতম্য, মেধার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আর আল্লাহ তা'আলা নারীদের স্বভাব ও চরিত্রের কারণে ঐ ধরনের নির্দেশ ও আদেশ জারি করেছেন। মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য নেই তবে পালনের পদ্ধতিগত দিক থেকে মেয়েলী স্বভাবের কারণে নারীদের জন্য এক রকম পদ্ধতি, নরের পুরুষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের ইবাদতের পদ্ধতি অন্য রকম। এ পার্থক্য সামান্য। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল করে জানেন নরের জন্য কি রকম আইন তৈরি করা হলে তার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। নারীর জন্যও তাদের সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে নরের পাশাপাশি তারা মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। তাই নারী ও নরের যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় তা অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- **নারীর শারীরিক পার্থক্য**

বিজ্ঞানীদের মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। নারীর আকৃতি, অবয়ব, অংগ-প্রত্যংগ হতে আরম্ভ করে শারীরিক অণু পরমাণু পর্যন্ত পুরুষ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। নারীর তুলনায় পুরুষের শারীরিক অবস্থা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী।

একজনের শরীর নরম, আরেকজনের শরীর থাকে শক্ত। একজনকে সন্তান উৎপাদন ও লালনপালন উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, আরেকজনের দৈহিক গঠন করা হয়েছে ব্যাপক পরিধিতে কাজকর্ম করার জন্যে। এ ক্ষেত্রে নারী আর পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভবপর নহে। এটি আল্লাহর সৃষ্টিগত পার্থক্য। নারীরা নরের চেয়ে দুর্বল। শক্তির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। একটি নরের যে পরিমাণ শক্তি বা সামর্থ্য থাকে নারীদের ততটা নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। এভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের চেয়ে, নারীদের শারীরিক শক্তি, দৈহিক কাঠামো ও গঠন এবং মেধার দিক থেকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদেরকে সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্যতম করে তৈরি করা

হয়েছে। নারী ও পুরুষের শারীরিক কাঠামো, দৃঢ়তা, সুস্থতা, ঋতুস্রাব, গঠন এবং হরমোনের কারণে আল্লাহ তা'আলা নর ও নারীর জন্য একই ধরনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেনি।

- **নারীর মানসিক পার্থক্য**

মেধাগত এবং মানসিকগতভাবেও তারা নরের চেয়ে পেছনে আছে। নারীর জ্ঞানশক্তি নরের জ্ঞানশক্তি থেকে যতদিন দুর্বল ঠিক ততখানি পার্থক্য দেখা দেয় তাদের রুচিবোধের ভেতর। তাদের স্বভাব সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তাই দেখা যায় তাদের ভাল-মন্দ বিচার পুরুষের ভাল-মন্দ বিচারের সাথে সাধারণত এক হয় না। তাই নারীর ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। নারীরা হাল্কা ব্যাসিক এসিডের ঘ্রাণ বিশ হাজারের এক ভাগ হলে অনুভব করতে পারে। পক্ষান্তরে নর এক হাজার ভাগের একভাগ হলেই অনুভব করতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের ঘ্রাণশক্তি নরের চেয়ে দুর্বল। স্বাদ ও ঘ্রাণে এবং স্মরণশক্তির দিক দিয়ে নরেরা নারীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

- **নারীর অঙ্গের পার্থক্য**

নারীরা গর্ভধারণ করতে পারে। নরেরা তা পারে না। নারীরা সন্তানকে দুধ খাওয়ানের কারণে তাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকে। তাদের ভিতরের অঙ্গে জরায়ু আছে। এ অঙ্গগুলো তাদের বেশি। আর এ কারণে তারা নারী। এ বৈশিষ্ট্য নারীদের সম্পূর্ণভাবে রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের ওপরই নির্ভর করে তাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন আলাদা, স্বভাব আলাদা। তাদের অনুভূতি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। যে কোন প্রভাব অতি সহজেই তাদের মনে দাগ কাটে। তারা নরের তুলনায় বেশি দুর্বলমনা।

- **নারীর সামাজিক দায়িত্ব পালনে পার্থক্য**

মানুষের রূহ অনন্তকালের জন্য স্থায়ী। তবে এ রূহকে স্বল্পতম সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে সৎ কল্যাণ করার জন্য। এ কর্মের ওপরই নির্ভর করে পরকালীন জীবনের অনন্ত সুখ। এ পৃথিবীতে মানুষের কর্মের স্থল দুটি। একটি পরিবারে, অন্যটি পরিবারের বাইরে। নর ও নারীর এ দায়িত্ব পালনের ভিন্নতা রয়েছে। নর ও নারী মিলেমিশে এ সংসার জীবনকে সুন্দরময় করার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ইসলামে। নর কাজ করবে বাহিরে, নারী থাকবে ঘরে। দুজনই যদি একই করে তাহলে আরেকটি কাজ সমাধান হওয়ার সুযোগ নেই। বলা যায় নারী যদি পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে বাইরে চলে যায় তাহলে পরিবারের যাবতীয় কাজ কে করবে? নারীদের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে প্রথমে তারা সন্তান গর্ভে ধারণ করে। এ দায়িত্ব নরের নেই। সন্তানকে লালন-পালন করা, স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে তা আঁকড়িয়ে রাখা, দুধ খাওয়ানো হল নারীর প্রথম দায়িত্ব। এ দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব সংসারে রাণী হিসেবে সংসার পরিচালনা করা। "সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে" প্রবাদ বাক্যটি যথার্থ সার্থকতায় রূপ দেয়াও তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। মসজিদে ইমামতি তারা করতে পারে না। এ দায়িত্ব নরের। সাক্ষীর ক্ষেত্রে তাদের ২ জন নারীকে একজন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

রাসূলে করীম বলেছেন- "এবং নারী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণারেক্ষণকারিণীর কর্ত্রী।"

নর ও নারীর জ্ঞান বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও দৈহিক আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারতম্য করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনে নর ও নারীর মধ্যে কর্ম বণ্টনের নীতি পূর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই রোজগার ও শ্রম মেহনতের জন্য দায়িত্বশীল আর নারীকে করা হয়েছে ঘরের পরিচালিকা। এজন্যে রাসূলে কারীম বলেছেন-

"তাদের ঘরই তাদের জন্যে সুখ শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের আকর।"

নারীরা ঘরে বসেই আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। মহানবী এ সম্পর্কে বলেছেন-

"যে মেয়েলোক তার ঘরে অবস্থান করলো, সে ঠিক আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মত কাজ সম্পন্ন করতে পারলো।"

ইমামতি করা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের নামাযের স্থান সম্পর্কেরাসূলে করীম বলেছেন- "আল্লাহর কাছে মেয়েলোকের সে নামায সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়, যা সে তার ঘরের অন্ধকারতম কোণে পড়েছে। এভাবে নর ও নারীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্বে প্রভেদ করেছেন। জানাযায় যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত উম্মে আতীয়া (রা) বলেছেন-"রাসূলে করীম আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু নরের জন্য এটা স্পষ্টভাবে বৈধ। প্রয়োজনের তাগিদে, না গেলেই নয় এরূপ ক্ষেত্রে নারীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে যাওয়া শর্ত দেয়া হয়েছে। নিরুপায় হলে তারা অবশ্য ঘরের বাইরে যেতে পারে। নবী করীম বলেছেন- "তোমরা আল্লাহর বাদীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো।"

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে- "আল্লাহর বাদীদেরকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করো না।" নারীদের একা সফর করার বিধান রাখা হয়নি। যেতে হলে মুহাররম পুরুষকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। নবী করিম বলেছেন- "মেয়েলোক আদৌ বিদেশ সফর করবে না, তবে কোন মুহাররম পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে করতে পারে।" নরের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তবে নারীদের জন্য অলংকার পরা জায়েয আছে। সুগন্ধি ছাড়া প্রসাধন ব্যবহার নারীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে নরের জন্য প্রযোজ্য নয়। জুমআর নামায পড়াও নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। রাসূলে করীম বলেছেন- "জুমআর নামায জামায়াতের সাথে পড়া সব মুসলমানদের ওপরই ফরয। তবে চার শ্রেণীর লোকদের তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে: ক্রীতদাস, মেয়েলোক, লেংড়া ও রোগী।"

নারী ও নরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে তাদের অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য বিদ্যমান। নারীদের প্রকৃত স্থান এবং আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর। এখানে থেকেই তারা প্রতিটি মৌলিক অধিকার অর্জন, সম্মান লাভ এবং আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। এতে কোন অসুবিধে হয় না। মানুষের মধ্যে নর ও নারী এ শ্রেণীবিভাগের কারণে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। যার যার দায়িত্ব থেকে সে সে ইবাদত করবে,

সমাজে সুখ ও শান্তি আনয়ন করবে এবং নর ও নারী উভয়কে সহযোগিতা করবে। নরকে দেওয়া হয়েছে বাহিরে কাজ আর তা সম্পন্ন করার জন্য যে যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও কাঠিন্য, অনমনীয়তা, কষ্ট, সহিষ্ণুতা, দুর্ধর্ষতার প্রয়োজন, তা কেবল পুরুষদেরই আছে। আর মেয়েদের আছে স্বাভাবিক কোমলতা, মসৃণতা, অসীম ধৈর্যশক্তি, সহনশীলতা, অনুপম তিতীক্ষা ঘরের অংগনকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলা, মানব বংশের কুসুম কোমল লোকদের গর্ভে ধারণ, প্রসবান্তে স্তন দান ও লালন-পালন করার দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও আল্লাহর মৌলিক ইবাদত করা হল তাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

৪. সৃষ্টিতত্ত্বের হিকমত: সমতা নাকি অভিন্নতা?

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাঁর 'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার' গ্রন্থে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন:

ইসলাম নারী ও পুরুষকে 'অভিন্ন' করেনি, বরং 'সমান' করেছে।
একটি ঘড়ির ভেতরের সব চাকা যদি সমান আকারের হতো তবে ঘড়িটি চলত না। তেমনি নারী ও পুরুষকে শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক কিছু ভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা সংসার ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে।

–(ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার)

৫. সূরা নিসার প্রেক্ষাপট:

মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পরবর্তী প্রাথমিক বছরগুলোতে সুরা নিসা শামিল হয় , এর বেশির ভাগই নাযিল হয় বদর যুদ্ধের পর । যখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি নানা রকম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যার সম্মুখীন ছিল। তৎকালীন সময়ে ইসলামী জীবনের একটি নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের ইবাদত, আখলাক ও সমাজব্যবস্থার জন্য বিস্তারিত বিধি-বিধানের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। শত্রুশক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল। ফলে নিজেদের

ভৌগলিক ও চিন্তা-চেতনাগত সীমারেখার সংরক্ষণের জন্য মুসলিমদের নিত্য-নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সূরা নিসা এই যাবতীয় বিষয়ে বিস্তারিত পথ-নির্দেশ পেশ করেছে। যেহেতু যে-কোনও সমাজের বুনিয়াদ স্থাপিত হয় এক মজবুত পারিবারিক কাঠামোর উপর, তাই এ সূরা পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-নিষেধের বর্ণনা দ্বারা শুরু হয়েছে। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলায় যেহেতু নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাই নারীদের সম্পর্কে এ সূরায় বিস্তারিত আহকাম পেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নাম হয়েছে সূরা নিসা ।

জাহিলী যুগে নারীদের প্রতি চরম জুলুম ও অবিচার করা হতো, তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো এবং সমাজ তাদেরকে কেবল ভোগের সামগ্রী মনে করতো। এই সূরা নাযিলের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল জাহিলী যুগের সেসব কুপ্রথা চিহ্নিত করে সমাজ থেকে তা নির্মূল করা এবং এই সূরার নাম 'নিসা' বা নারী রাখার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নারীজাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও সামাজিক সত্তা হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি ও অধিকার দান করেন। ওহুদ যুদ্ধের পর মদীনার বহু নারী বিধবা এবং বহু শিশু এতিম হয়ে পড়ায়, সুরার শুরুতেই এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত মিরাশ বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে অলঙ্ঘনীয় আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। একটি মজবুত পারিবারিক কাঠামোর ওপর সমাজের বুনিয়াদ গড়ার লক্ষ্যে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-নিষেধের বর্ণনা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের সীমা স্থির করা হয়েছে, যা সুরার ৩৫ নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই সূরাটি প্রমাণ করে যে ইসলাম সৃষ্টিতত্ত্বের শুরু থেকেই নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ নয়, বরং সহযোগী ও সম-মর্যাদার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এই সমতাই ইসলামের সকল সামাজিক ও আইনি বিধানের মূল ভিত্তি।

–রেফারেন্স: (তাওযীহুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩)

পাঠ ৩.২: "পুরস্কার, শাস্তি ও পরকালীন জবাবদিহিতায় সমতা"

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী সমাজকে 'আধ্যাত্মিক অযোগ্য' মনে করা হতো। অনেক প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাস করা হতো যে, নারী কেবল পুরুষের মাধ্যমে বা পরবর্তী জন্মে পুরুষ হয়ে জন্মালে তবেই মুক্তি পাবে। কিন্তু ইসলাম এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে

কুঠারাঘাত করে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর নৈকট্য ও পরকালীন জান্নাত লাভের ক্ষেত্রে লিঙ্গ কোনো অন্তরায় নয়; বরং একমাত্র মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া' বা পরহেজগারী।

১. তাকওয়ার ক্ষেত্রে সমতা ; সূরা আহযাবের বিশ্লেষণ

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা মহিলা, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? নারীদের কথা কি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে না? উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন: একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম এমন সময় মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলি ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তাঁর কথাগুলি শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিম্বরে পাঠ করছিলেন:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَا لْمُسْلِمٰتِ وَا لْمُؤْمِنِيْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتِ وَا لْقٰنِتِيْنَ وَا لْقٰنِتٰتِ وَا لصّٰدِقِيْنَ وَا لصّٰدِقٰتِ وَا لصّٰبِرِيْنَ وَا لصّٰبِرٰتِ وَا لْخٰشِعِيْنَ وَا لْخٰشِعٰتِ وَا لْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَا لصَّآئِمِيْنَ وَا لصّٰٓئِمٰتِ وَا لْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَا لْحٰفِظٰتِ وَا لذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

"মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাপালনকারী পুরুষ ও রোযাপালনারী নারী, যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী- আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"

–(সুরা আহযাব ৩৩: ৩৫)

নারীর আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সবচেয়ে বড় দলীল হলো সূরা আহযাবের এই ৩৫ নম্বর আয়াত।এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ১০টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন (যেমন: সত্যবাদিতা, ধৈর্য, বিনয়)। প্রতিটি গুণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়কে আলাদা

আলাদাভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। ইসলামে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত।
–(তাফসীরে ইবনে কাসির)

২. আমল ক্ষেত্রে সমতা
পবিত্র কুরআনে জান্নাতের ঘোষণা কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব।" –(সূরা নাহল,১৬: ৯৭)

আমল ও পরকালীন সাফল্যের সর্বজনীন ঘোষণা:
আধ্যাত্মিক জগতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের সবচেয়ে বড় ও অকাট্য দলীল হলো সূরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا
"আর নারী বা পুরুষের মধ্যে যে কেউ মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" –(সূরা নিসা ৪: ১২৪)

অর্থাৎ একজন নারী যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোনো নেক আমলও করেন, আল্লাহ তার মর্যাদা একবিন্দুও ক্ষুণ্ণ করবেন না। জাহেলী যুগে যেখানে ভাবা হতো নারীর কোনো পরকালীন গুরুত্ব নেই, এই আয়াত সেই ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করেছে।
মুফতী হিফজুর রহমান তাঁর 'ইসলামে নারীর মূল্যায়ন' গ্রন্থে লিখেছেন, এই আয়াতটি প্রমান করে যে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বা প্রশান্তিময় জীবন লাভ এবং পরকালে জান্নাতের স্তরে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে একবিন্দু বৈষম্য নেই। ইসলামের

দৃষ্টিতে একজন নারী আমলের মাধ্যমে রাবেয়া বসরীর মতো শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছাতে পারেন।

৩.দুনিয়াবি ও পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রে সমতা

যে পুরুষ বা যে নারী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, রাসূলায়ার-এর আনুগত্য করে না তাদের আবাস দোজখে। আবার যারা মুসলমান হয়েও অপরাধ করে থাকে তাদের জন্যও যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তার ক্ষেত্রে নারীদের জন্যে বিশেষ কঠিন কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। অপরাধী হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান এবং উভয়েই সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। নারী হোক, বা পুরুষই হোক অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের শাস্তি সমান। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

وَا لَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِـاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّا رِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"
–(সূরা আল- বাকারা ২: ৩৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِا لْاِ يْمَا نِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَا بٌ اَ لِيْمٌ

"যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে, তারা কক্ষনো আল্লাহর কিছুমাত্র অনিষ্ট করতে পারবে না, তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"
–(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৭)

কোন পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাদের জন্যে একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

اَلزَّا نِيَةُ وَا لزَّا نِيْ فَا جْلِدُوْا كُلَّ وَا حِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ وَا لْيَوْمِ الْاٰ خِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ামায়া তোমাদেরকে যেন প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। একদল মু'মিন যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"
–(সূরা আন নূর ২৪:২)

আবার একজন পুরুষ বা নারী চুরি করলে উভয়ের জন্য একই ধরনের শাস্তি র বিধান রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

وَا لسَّا رِقُ وَا لسَّا رِقَةُ فَا قْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَـكَا لًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَا للّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। –(সূরা আল মায়িদা ৫:৩৮)

এ শাস্তির বিধান করার উদ্দেশ্য চুরি বা ব্যভিচারি বা ব্যভিচারিণীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। দু'জনকে আবার একত্রে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

قُلْ لِّـلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُـضُّوْا مِنْ اَبْصَا رِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَـعُوْنَ
وَقُلْ لِّـلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَـضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ

মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত।"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়।
–(সূরা আন নূর ২৪: আয়াত-৩০-৩১)

নারী আর পুরুষদেরকে সমভাবে শাস্তির বিধান থেকে রক্ষা করার জন্যে উত্তম জীবন গঠনের জন্যে সমভাবে মহান আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন। যারা বভিচারী বা ব্যভিচারিণী তাদের জন্যে বিশ্বাসী পুরুষ বা বিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে বিধানের সমতা রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

اَلزَّا نِيۡ لَا يَنۡكِحُ اِلَّا زَا نِيَةً اَوۡ مُشۡرِكَةًۖ وَّ الزَّا نِيَةُ لَا يَنۡكِحُهَاۤ اِلَّا زَا نٍ اَوۡ مُشۡرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

"ব্যভিচারী বিয়ে করে না ব্যভিচারিণী বা মুশরিকা নারী ছাড়া। আর ব্যভিচারিণী- তাকে বিয়ে করে না ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া, মু’মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

–(সূরা আন নূর২৪:৩)

৪. পরকালীন জবাবদিহিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ইসলাম প্রতিটি নারীকে একজন স্বাধীন 'ব্যক্তি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরকালে কোনো নারী তার বাবা বা স্বামীর পরিচয়ে নয়, বরং নিজের আমলনামার ভিত্তিতে বিচারিত হবে।

কুরআনী মূলনীতি:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ"।

–(সূরা মুদ্দাসসির ৭৪: ৩৮)।

এই বিধানটি নারীর মানবিক মর্যাদা ও স্বকীয়তাকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে। কোনো পুরুষ চাইলেই তার অধীনস্থ নারীর ওপর পাপের বোঝা চাপাতে পারবে না, আবার নারীর নেক আমলের সওয়াবও পুরুষ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

আধ্যাত্মিক ও ত্যাগের মহিমায় নারী: কয়েকটি ঐতিহাসিক উপাখ্যান

ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়, বরং ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর জীবন্ত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতার এই আকাশছোঁয়া উচ্চতা বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ইসলামের সেই স্বর্ণযুগের দিকে, যেখানে নারী তাঁর ঈমান ও আমলের মাধ্যমে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

৪. আধ্যাত্মিক আদর্শ: ফেরাউনের স্ত্রী ও মরিয়ম (আ.)

নারীদের আধ্যাত্মিক শক্তি যে পুরুষদের চেয়ে কম নয়, তা বোঝাতে আল্লাহ তাআলা কুরআনে দুইজন মহীয়সী নারীর উদাহরণ দিয়েছেন যা সমস্ত মুমিনের (পুরুষ ও নারী) জন্য আদর্শ:

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَاَ تَ فِرْعَوْنَ....وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ

"আর যারা ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। "আর (দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ‘ইমরান-কন্যা মারইয়ামের
–(সূরা তাহরীম ৬৬: আয়াত **১১-১২**)

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেননি যে "আল্লাহ মুমিন নারীদের জন্য উদাহরণ দিয়েছেন", বরং বলেছেন "যারা ঈমান আনে(পুরুষ ও নারী সবার জন্য)। অর্থাৎ একজন নারীর ঈমানী দৃঢ়তা বিশ্বের সকল মুমিন পুরুষের জন্যও অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

৫. ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় উম্মুল মুমিনীনগণের ভূমিকা

আধ্যাত্মিক মর্যাদা কেবল ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জ্ঞানের (ইলম) মধ্যেও নিহিত।

উদাহরণ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে প্রায় **২২১০**টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের অনেক আধ্যাত্মিক ও শারঈ মাসআলা তাঁর মাধ্যমেই উম্মত জানতে পেরেছে।

উম্মুল মুমিনীনরা প্রমাণ করেছেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে নারী সমাজ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. আধ্যাত্মিক সাধনায় শ্রেষ্ঠত্বের শিখর: রাবেয়া বসরী (রহ.)

ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং এটি ইতিহাসের পাতায় প্রমাণিত। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন প্রখ্যাত নারী সুফী সাধক হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)। যুগে যুগে আধ্যাত্মিকতার যে মশাল জ্বলেছে, তার অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)। তাঁর জীবন ছিল ইশক-এ-ইলাহী বা আল্লাহর প্রেমের এক জীবন্ত তাফসীর। তৎকালীন বসরা নগরীর বড় বড় আলেম ও আধ্যাত্মিক সম্রাটরা, যেমন হাসান বসরী (রহ.),এর মতো বড় স্তরের মুজতাহিদ ও তাত্ত্বিকরা রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর কাছে আধ্যাত্মিক নসিহত নিতে আসতেন।

একবার রাবেয়া বসরী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি জান্নাতের আশায় ইবাদত করেন? তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আজও আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শক। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি জাহান্নামের ভয়ে তোমার ইবাদত করি তবে আমাকে জাহান্নামে পুড়িয়ে দিও, আর যদি জান্নাতের লোভে ইবাদত করি তবে আমাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করো। আমি তো ইবাদত করি কেবল তোমার মহব্বতে।" তিনি ইবাদত করতেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাঁর এই উক্তি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পরিচয় এবং আধ্যাত্মিক নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে একজন নারী পুরুষের সমান তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরও শিক্ষক হতে পারেন।এটি প্রমাণ করে যে,ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় একজন নারী এমন স্তরে পৌঁছাতে পারেন যা পুরুষের জন্য আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

তাঁর জীবন ছিল সূরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন-যেখানে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন নারী ও পুরুষের নেক আমলের প্রতিদান একবিন্দুও কম করা হবে না।

৮. জিহাদের ময়দানে নারী সাহাবীর দৃষ্টান্ত: উম্মে আম্মারা (রা.)

আধ্যাত্মিক মর্যাদা কেবল তসবিহ পাঠে নয়, বরং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল বাজি রাখার মধ্যেও নিহিত। এ ক্ষেত্রে নুসায়বা বিনতে কাব (রা.), যিনি উম্মে আম্মারা নামে পরিচিত, তাঁর বীরত্ব এক ঐতিহাসিক বিস্ময়।

ওহুদের সেই বীর নারী:

ওহুদের রণক্ষেত্র। ইসলামের ইতিহাসে এক কঠিনতম পরীক্ষা। যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম বাহিনীর শৃঙ্খলা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং একদল অতর্কিত আক্রমণকারী সরাসরি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দিকে ধাবিত হয়, তখন এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা যায়। পুরুষ সাহাবীদের ভিড় ঠেলে একজন নারী তলোয়ার হাতে ঢাল হয়ে দাঁড়ান নবীজি (সা.)-এর সামনে। তিনি নুসায়বা বিনতে কাব (রা.), ইতিহাসে যিনি 'উম্মে আম্মারা' নামে পরিচিত।

তীর, নেজা আর তলোয়ারের ঝনঝনানির মাঝেও তাঁর পা কাঁপেনি। তিনি সেদিন নিজের শরীরকে নবীজি (সা.)-এর বর্ম বানিয়ে দিয়েছিলেন। নবীজি (সা.) নিজেই পরবর্তীকালে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, ওহুদের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে আমি ডানে বা বামে যেদিকেই তাকিয়েছি, কেবল উম্মে আম্মারাকেই যুদ্ধ করতে দেখেছি। তাঁর শরীরে সেবার তেরটি তলোয়ার ও তীরের আঘাত ছিল কিন্তু তাঁর মুখে ছিল প্রশান্তির হাসি। তিনি যুদ্ধের সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও কেবল একটি আবদার করেছিলেন- "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন জান্নাতে আপনার সাথী হতে পারি।রাসূল (সা.) তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা দেখে দুআ করেছিলেন- "হে আল্লাহ! এদেরকে (নুসায়বার পরিবারকে) জান্নাতে আমার সাথী বানিয়ে দিন।"

এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর দৌড়ে একজন নারী কতটা অগ্রগামী হতে পারেন।আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীনের খিদমতে একজন নারী সর্বোচ্চ ত্যাগ(শাহাদাত) ও জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের দাবিদার হতে পারেন ।

–(সিরাতে ইবনে হিশাম (ওহুদ যুদ্ধ অধ্যায়); নারী সাহাবীদের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃষ্ঠা ৫২-৫৫)

উম্মে আম্মারা (রা.)-এর বীরত্ব এবং রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর আধ্যাত্মিকতা কোনো বিচ্ছিন্ন কাহিনী নয়। বরং এগুলো ইসলামের সেই শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ, যা নারীকে কেবল ঘরের চার দেয়ালে নয়, বরং আরশের মালিকের সাথে সরাসরি সম্পর্কের অধিকার দান করেছে। পাশ্চাত্য নারীবাদ যেখানে নারীকে শরীরী লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়েছে, ইসলাম সেখানে নারীকে রুহানী বা আত্মিক লড়াইয়ের মাধ্যমে অমরত্ব দান করেছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অনস্বীকার্য যে, আধ্যাত্মিক জগতে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। বরং ইসলামই নারীকে 'মানুষ' হিসেবে আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্কের অধিকারী করেছে, যেখানে কোনো মধ্যস্থতা বা লিঙ্গীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজন নেই।

পাঠ ৩.৩: "কন্যাসন্তান হিসেবে নারীর মর্যাদা"

ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যাসন্তান কোনো সাধারণ সৃষ্টি নয়, বরং সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মা-বাবার প্রতি প্রেরিত এক বিশেষ উপহার বা রহমত। কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য অনুযায়ী, কন্যাসন্তান লাভ করা এবং তাকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা জান্নাত লাভের অন্যতম সহজ মাধ্যম।

১. কন্যাসন্তান মহান আল্লাহর বিশেষ দান (কুরআনী ঘোষণা)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সন্তান দান করাকে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও করুণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَا لْاَ رْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَا ثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ
"আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, যা চান তিনি সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দেন।"
–(সূরা আশ শুরা ৪২: ৪৯)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'পুত্র' সন্তানের আগে 'কন্যা' সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, কন্যা সন্তান মোটেও অবহেলার নয়, বরং আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

২. কন্যাসন্তান লালন-পালনের শারঈ ফযীলত ও জান্নাতের সুসংবাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) কন্যাসন্তান লালন-পালনকে এমন এক মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যা সমকালীন বিশ্বের জন্য ছিল এক বিস্ময়কর বার্তা। তিনি কেবল কন্যা সন্তানের জীবন রক্ষা করেননি, বরং তাকে জান্নাতের ওসীলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

নবীজি (সা.) বলেন:
"যে ব্যক্তির দুজন কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাদের সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন ও দেখাশোনা করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে থাকব (নবীজি তাঁর দুই আঙ্গুল একত্রে করে দেখালেন)।"
–(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৩১)

এই হাদীসের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, কন্যাসন্তানের পিতা-মাতা পরকালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করবেন। মুফতী হিফজুর রহমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'লালন-পালন' বলতে কেবল অন্ন-বস্ত্র নয়, বরং তাদের দ্বীনি শিক্ষা ও উত্তম আদব-কায়দা শেখানোকেও বোঝানো হয়েছে।
–(হিউম্যান বিয়িং, ইফতেখার সিফাত)

অন্য এক হাদীসে নবীজি (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তানকে আশ্রয় দেবে (লালন-পালন করবে), তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে এবং তাদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।" –(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৪২৪৮)

৩. নিজ কন্যার প্রতি নবীজি (সা.)-এর আচরণ: সীরাতের আলোকোজ্জ্বল পাঠ

রাসুলুল্লাহ (সা.) কন্যাদের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে, তা তাঁর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে আচরণের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানানো:

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখনই ফাতেমা (রা.) নবীজি (সা.)-এর কাছে আসতেন, নবীজি (সা.) তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি ফাতেমার হাত ধরে চুমু খেতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন। ঠিক একইভাবে নবীজি (সা.) যখন ফাতেমার ঘরে যেতেন, ফাতেমাও দাঁড়িয়ে তাঁর পিতাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে কন্যা কেবল স্নেহের পাত্রী নয়, বরং সে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধারও দাবিদার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হয়েও নিজের মেয়ের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া ছিল বিশ্বজুড়ে কন্যাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

–(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২১৯; সীরাতে ইবনে হিশাম)

"ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা":

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে পৃথিবীর সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন:

"ফাতেমা আমার শরীরের একটি অংশ (কলিজার টুকরা)। যে তাকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল।" –(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৩৭০৪)

বিদায় ও মিলনের মুহূর্ত:

নবীজি (সা.) যখন কোনো সফরে বের হতেন, তখন সবার শেষে ফাতেমার সাথে দেখা করে যেতেন। আবার সফর থেকে ফিরে সর্বপ্রথম ফাতেমার ঘরে গিয়ে তাঁর কুশল বিনিময় করতেন। এই ধারাবাহিক আচরণটি প্রমাণ করে যে, একজন পিতার হৃদয়ে কন্যার অবস্থান কতটা গভীর। সাইয়্যেদ আলী নদভী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নবীজি (সা.)-এর এই মমতা কেবল ফাতেমার জন্য ছিল না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল পিতার জন্য আদর্শ হিসেবে ছিল।

–(আল-ইসাবা ফী তামিযিস সাহাবা)

৪. কন্যাসন্তান ও রিযিকের বরকত

ইসলাম এই ভ্রান্ত ধারণা সমূলে উৎপাটিত করেছে যে কন্যা সন্তান দারিদ্র্য ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন:

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَا دَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَا قٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِ يَّا كُمْ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَا نَ خِطْاً كَبِيْرًا

"দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা মহাপাপ।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ৩১)

কন্যাসন্তানকে রিযিকের সংকীর্ণতার কারণ মনে করা জাহেলী কুসংস্কার। বরং কন্যা সন্তান জন্মের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ সেই ঘরে রিযিকের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। ইসলাম কন্যা সন্তানকে যে রাজকীয় সম্মান ও অধিকার দান করেছে, তা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ দিতে পারেনি। আজকের যুগে যারা কন্যাসন্তান হওয়াকে অলক্ষুণে মনে করে, তারা মূলত ইসলামের মূল চেতনা থেকেই বিচ্যুত। ইসলামের শিক্ষায় কন্যা হলো জান্নাতের বারতা এবং রবের বিশেষ অনুগ্রহ।

পাঠ ৩.৪: "মাতা হিসেবে নারীর সর্বোচ্চ সম্মান"

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর সবচেয়ে মহিমান্বিত এবং শ্রদ্ধেয় রূপ হলো 'মা'। পাশ্চাত্য নারীবাদ যেখানে মাতৃত্বকে একটি 'শৃঙ্খল' বা ক্যারিয়ারের পথে 'বাধা' হিসেবে চিত্রায়িত করে, ইসলাম সেখানে মাতৃত্বকে নারীর জন্য জান্নাতের চাবিকাঠি এবং ইহকালীন সম্মানের সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে ঘোষণা করেছে। মাতৃত্ব কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি মহান পবিত্র দায়িত্ব যা মহান আল্লাহ নারীর ওপর অর্পণ করেছেন।

১. আল্লাহর ইবাদতের পর মায়ের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ (কুরআনী দলীল)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ইবাদত ও তাওহীদের নির্দেশের পরপরই পিতামাতার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে মায়ের ত্যাগ ও কষ্টকে বিশেষভাবে হাইলাইট করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا نقل لهما اف ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ২৩)

অন্যত্র মায়ের কষ্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصالة في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখো) আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।"
–(সূরা লুকমান,৩১: ১৪)

ইসলামে পিতামাতার অধিকারকে আল্লাহর হকের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে এর গুরুত্বকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সূরা লুকমানের এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে মা যে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করেন, তার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। আল্লাহ এখানে নিজের কৃতজ্ঞতার সাথে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে অপরিহার্য করেছেন ।

২. হাদীস শাস্ত্রের আলোকে মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও বিভিন্ন হাদীসে মায়ের মর্যাদা নিয়ে এমন সব ঘোষণা এসেছে যা সমকালীন বিশ্বের সকল বৈষম্য দূর করে দিয়েছে।

ক) জান্নাত লাভের পথ:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক সাহাবী এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। নবীজি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি জীবিত আছেন?" তিনি বললেন, "জি হ্যাঁ।" নবীজি (সা.) বললেন-

"তুমি তাঁর খিদমতে লেগে থাকো, কেননা তাঁর পায়ের নিচেই রয়েছে জান্নাত।" –(সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-৩১০৪)

এই একটি হাদীসই মায়ের মর্যাদাকে আধ্যাত্মিক জগতের চূড়ায় নিয়ে গেছে। মুফতী হিফজুর রহমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জান্নাত লাভের জন্য যেমন জিহাদ বা ইবাদত প্রয়োজন, মায়ের সেবা করা তার চেয়েও সহজ ও নিশ্চিত পথ।

খ) তিনগুণ বেশি মর্যাদা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বিখ্যাত হাদীস মাতা হিসেবে নারীর মর্যাদাকে পৃথিবীর সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার থেকে সর্বোত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" চতুর্থবার যখন লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তখন নবীজি (সা.) উত্তর দিলেন, "তোমার বাবা।

–(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৯৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৪৮)

তিনবার মায়ের নাম উল্লেখ করার হিকমত ও রহস্য:

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন মায়ের কথা তিনবার এবং বাবার কথা একবার বললেন, তার ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীন ও ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিছু পয়েন্ট তুলে ধরেছেন। ইমাম নববী (রহ.) এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর মতে, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা এমন তিনটি বিশেষ কষ্ট সহ্য করেন যা বাবা করেন না:

ক) গর্ভধারণ (Pregnancy): দীর্ঘ দশ মাস অত্যন্ত যন্ত্রণার সাথে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা।

খ) প্রসব বেদনা (Childbirth): মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার মাধ্যমে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানো।

গ) স্তন্যদান (Breastfeeding): নিজের শরীরের রক্তকে দুধ বানিয়ে দুই বছর সন্তানকে পান করানো এবং নির্ঘুম রাত কাটানো।

পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে (কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ) এবং সূরা আহক্বাফের ১৫ নম্বর আয়াতে (কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ ও কষ্টের সাথে প্রসব করা) এই তিনটি বিশেষ ত্যাগের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এই তিনটি মৌলিক ও যন্ত্রণাদায়ক কাজে বাবার কোনো অংশীদারিত্ব নেই, তাই সেবার ক্ষেত্রেও মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশি রাখা হয়েছে।

বাবার অধিকারের গুরুত্ব:

অনেকে মনে করতে পারেন যে মাকে তিনগুণ গুরুত্ব দিলে বাবার মর্যাদা কমে যায় কি না। জাস্টিস তকী উসমানী তাঁর 'পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম' গ্রন্থে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, মা যেমন সন্তানকে অস্তিত্ব দান করেন, বাবা তেমনি সেই সন্তানের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেন। হাদীসে বাবাকে চতুর্থবার উল্লেখ করার অর্থ হলো-মায়ের পর পৃথিবীতে আর কারোরই বাবার সমান হওয়ার যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ বাবার মর্যাদা দ্বিতীয় নয়, বরং মায়ের পর তিনিই প্রথম।

৩. সীরাতের পাতায় মায়ের প্রতি নবীজি (সা.)-এর ভালোবাসা ও সম্মান

নবীজি (সা.)-এর জীবনে মায়ের প্রতি যে মমতা ও শ্রদ্ধা আমরা দেখি, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

হযরত হালিমা সা'দিয়া (রা.)-এর প্রতি সম্মান:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুধমা হযরত হালিমা (রা.) যখন নবীজির কাছে আসতেন, নবীজি (সা.) অত্যন্ত আবেগের সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং 'মা, মা' বলে তাঁকে সম্বোধন করতেন। তিনি নিজের গায়ের চাদরটি বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসার জায়গা করে দিতেন। নিজের গর্ভধারিণী মা না হওয়া সত্ত্বেও কেবল দুধমা হওয়ার কারণে নবীজির এই সম্মান প্রদর্শন উম্মতকে শিক্ষা দেয় যে, মাতৃত্বের সম্পর্ক কতটা পবিত্র ও মহান। –(সীরাতে ইবনে হিশাম; আল-ইসাবা ফী তামিযিস সাহাবা)

মায়ের কবরের পাশে নবীজির অশ্রু:

হিজরতের পর একবার নবীজি (সা.) তাঁর মা হযরত আমেনার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এত অঝোরে কাঁদলেন যে সাথে থাকা সাহাবীরাও কাঁদতে লাগলেন। নবীজি (সা.) বললেন, "আমি আমার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলাম (তখনো ইসলাম আসেনি), কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। তবে কবরের যিয়ারতের অনুমতি পেয়েছি।" মায়ের প্রতি এই অকৃত্রিম মমতা ও চোখের পানি প্রমাণ করে যে, নবীজির হৃদয়ে মায়ের স্মৃতি কতটা অমলিন ছিল।
–(সহীহ মুসলিম; সীরাতে মোস্তফা, ইদ্রিস কান্ধলভী)

৪. মা হিসেবে নারীর সামাজিক ও আইনগত সুরক্ষা

ইসলামী শরীয়তে মায়ের ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সন্তানের ওপর ফরয করা হয়েছে।

আর্থিক নিরাপত্তা: যদি কোনো মা অভাবগ্রস্ত হন, তবে তার সন্তান (পুত্র বা কন্যা) সামর্থ্যবান হলে মায়ের সমস্ত খরচ বহন করা তার জন্য ওয়াজিব। এটি কেবল দয়া নয়, বরং মায়ের আইনগত অধিকার।

উত্তরাধিকার: সম্পত্তিতেও মায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট হিস্যা রাখা হয়েছে, যা কেউ হরণ করতে পারে না।

৪. বিধর্মী মায়ের প্রতি আচরণ কেমন হবে !

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ.

আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফাতওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ কর। –(মুসলিম ১২/১৪ হাঃ ১০০৩, আহমাদ ২৬৯৮১)

মায়ের অধিকার এতটাই অকাট্য যে, ধর্ম ভিন্ন হলেও সন্তানের ওপর মায়ের সেবা করার ফরযিয়্যাত বা আবশ্যকতা শেষ হয়ে যায় না। (রেফারেন্স: সহীহ বুখারী; সীরাতে ইবনে হিশাম)

উপরোক্ত আয়াত, হাদীস ও সীরাতের ঘটনাবলি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলাম মাতৃত্বকে একটি ঐশী সম্মানের মুকুট হিসেবে নারীর মাথায় পরিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদ যেখানে মাকে 'অবৈতনিক দাসী' হিসেবে দেখে, ইসলাম সেখানে তাকে 'জান্নাতের চাবিকাঠি' হিসেবে ঘোষণা করেছে। সাইয়্যেদ আলী নদভী (রহ.) যথার্থই বলেছেন, মুসলিম সমাজ মাতৃত্বের এই মর্যাদা রক্ষা করার মাধ্যমেই একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম।

পাঠ ৩.৫: “দাম্পত্য জীবনে নারীর অধিকার: বিয়ে, মোহরানা ও খোরপোশ প্রসঙ্গ”

ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে কেবল একটি সামাজিক প্রথা এবং জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসেবে দেখেনি, বরং একে নারী ও পুরুষের প্রশান্তির কেন্দ্র এবং একটি পবিত্র ও মজবুত বন্ধন, যাকে পবিত্র কুরআন 'মিছাকান গালীজা' (সুদৃঢ় অঙ্গীকার) হিসেবে অভিহিত করেছে। পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনে যেখানে বিবাহকে নারীর পরাধীনতা হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়, ইসলাম সেখানে বিবাহের মাধ্যমে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান এবং আত্মিক প্রশান্তি নিশ্চিত করেছে।বিবাহের শুরুতেই 'মোহরানা' এবং দাম্পত্য জীবনে 'খোরপোশ' প্রদানের বাধ্যবাধকতা নারীর আর্থিক স্বকীয়তার এক অনন্য শারঈ দলিল।

১. বিবাহের মূল লক্ষ্য: প্রেম ও প্রশান্তি (কুরআনী দলীল)

আল্লাহ তাআলা দাম্পত্য জীবনের হিকমত বর্ণনা করে একাধিক আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন।"
–(সূরা রুম ৩০: ২১)

বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তা কোনো জাগতিক চুক্তির ফল নয়, বরং এটি মহান আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ কুদরত। এখানে প্রশান্তি শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে, নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম নয়, বরং সে পুরুষের জীবনের শান্তি ও স্থৈর্যের উৎস। নারীর মূল কাজ ও বৈশিষ্ট্য হলো তার সঙ্গীর অস্থিরতা দূর করে হৃদয়কে শান্ত করা। এটি নারীর এক বিশেষ সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব।

পরিপূরকতা (Complementarity :

নারীবাদ যেখানে 'সমতা'র দোহাই দিয়ে নারী ও পুরুষের পার্থক্য মুছে ফেলতে চায়, ইসলাম সেখানে উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে তাদের মাঝে মহব্বতের সেতুবন্ধন তৈরি করে। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় সম্পর্ক বোঝাতে বলেছেন:

هن لباس لكُم وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা (নারীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (পুরুষরা) তাদের পোশাক।"
–(সূরা বাকারা, ২: ১৮৭)

আয়াত বিশ্লেষণ :
মুফতী তকী উসমানী তাঁর 'পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম' গ্রন্থে এই আয়াতের তিনটি গভীর দিক তুলে ধরেছেন :
১. **আবরণ**: পোশাক যেমন মানুষের শরীরের ত্রুটি ঢেকে রাখে,নিরাপত্তা দেয় এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্বামী ও স্ত্রীও একে অপরের গোপনীয়তা ও মান-সম্মান রক্ষা করবে এবং জীবনকে সুন্দর করবে। ইসলাম নারী ও পুরুষকেও একে অপরের মর্যাদা রক্ষাকারী ও সৌন্দর্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২. **নিরাপত্তা ও আরাম:** পোশাক যেমন শরীরকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে আরাম দেয়, নারী ও পুরুষও একে অপরের প্রশান্তির মাধ্যম।

৩. **নৈকট্য**: পোশাক ও শরীরের মাঝে যেমন তৃতীয় কোনো ব্যবধান থাকে না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্ক। পোশাক ও শরীরের যে সম্পর্ক, ইসলাম নারী ও পুরুষের মাঝে সেই নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এটি কোনো অসম প্রতিযোগিতা নয়, বরং এক আত্মিক পূর্ণতা।
–(পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম)

২.স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার

নারী- তা সে অবিবাহিত হোক, বা তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা- সে তার বিবাহের জন্যে উত্থাপিত যেকোনো প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। কোনো মেয়ে বা মহিলাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার অধিকার তার পিতা, ভাই বা কোনো দায়িত্বশীল কারোরই নেই। এ ব্যাপারে প্রিয় নবীর হাদিস অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন- "স্বামী-পরিত্যক্তা (অর্থাৎ যে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত) নারীর বিয়ে তার অনুমতি অর্জন ছাড়া দেওয়া যাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী বলেছেন-
"কুমারীর (মেয়ের) বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দেওয়া যাবে না।" এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, আমি প্রিয় নবীকে বললাম- "কুমারী মেয়েতো লজ্জা করে, সে কিভাবে অনুমতি দেবে? প্রিয় নবী জবাব দিলেন- তার নীরবতাই হচ্ছে অনুমতি।"(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অর্থাৎ মেয়ের কাছে যদি অনুমতি চাওয়া হয় এবং তাতে চুপ করে থাকে-কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে তাহলে সেটাকে অনুমতি বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যদি বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তের বিয়ে হয়, তার পরামর্শ ও স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি ছাড়া যদি বিয়ে দেওয়া হয় তবে সেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। অন্যদিকে কুমারী মেয়ের থেকে যদি (স্পষ্ট ভাষায়) অনুমতি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বিয়ের পর সেই বিয়েকে ভঙ্গ করা অথবা ঠিক রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে।

এভাবে মানবতার ইতিহাসে প্রথম ও শেষবার মহিলা এতোবড় অধিকার ও মর্যাদা পেলো। ইসলাম তাকে এই ক্ষমতা দিলো যে, সে তার বিয়ের ব্যাপারে আগত প্রস্তাবসমূহকে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে বা ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে। অথচ ইসলামের আগে কোনো নারীর গ্রহণ বা বর্জনের কোনোরকম অধিকার ছিল না। তখন তার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো পুরুষেরাই। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম ছিল না। বাজারের পণ্যসামগ্রীর মতো যেকোনো পুরুষ তাকে ক্রয়-বিক্রয় করতো।

৩. মোহরানা: নারীর আর্থিক সম্মানের প্রতীক

ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে মোহরানা বা কনের মূল্য কনের পিতাকে দেওয়া হতো। ইসলাম এসে এই প্রথা বাতিল করে মোহরানাকে সরাসরি 'নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وأتوا النساء صدقاتهن نحلة

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করো।"
–(সূরা নিসা ৪: ৪)

মোহরানা হলো বিবাহের এমন এক অপরিহার্য বিনিময় যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তার সম্মানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়। এটি কোনো দয়া নয়, বরং স্ত্রীর 'শারঈ পাওনা'। স্ত্রী যদি খুশি হয়ে কিছু অংশ মাফ করে দেয় তবেই কেবল স্বামী তা গ্রহণ করতে পারে, অন্যথায় মোহরানা পরিশোধ করা স্বামীর ওপর ফরজ।

৪. খোরপোশ (Maintenance): নারীর অর্থনৈতিক সুরক্ষা

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সমস্ত মৌলিক প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা) নিশ্চিত করার দায়িত্ব এককভাবে স্বামীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"আর পিতার (সন্তানের বাবার) কর্তব্য হলো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের (মায়েদের) আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।" –(সূরা বাকারা ২: ২০০)

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় এসেছে:

اسكلوهن من حيث سكنتم من وجدكم

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে নিজেরা বসবাস করো, সেখানে তাদের (স্ত্রীদের) বসবাসের ব্যবস্থা করো।" –(সূরা তালাক ৬৫: ০৬)

বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ:
ইসলাম নারীকে উপার্জনের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার ভরণপোষণের ভার পুরুষের ওপর দিয়েছে। এটি নারীর অসম্মান নয়, বরং তার 'অর্থনৈতিক মুক্তি'। স্বামী কোটিপতি হলেও স্ত্রীর খোরপোশ দেওয়া তার দায়িত্ব, আবার স্ত্রী ধনী হলেও তার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে খরচ করার জন্য স্বামী তাকে বাধ্য করতে পারে না।

৫. বিদায় হজ্জের ভাষণ: নারীর অধিকারের বৈশ্বিক সনদ
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে নারীদের অধিকার নিয়ে যে কালজয়ী নির্দেশনা দিয়েছেন, তা আধুনিক মানবাধিকারের জননী। তিনি লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে ঘোষণা করেন:

"হে লোকসকল! তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বৈধ করেছ। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো তোমরা উত্তমরূপে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করবে।"
–(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- **১২১৮**; সীরাতে ইবনে হিশাম)

বিশ্লেষণ:
এই ভাষণে নবীজি (সা.) স্ত্রীকে 'আল্লাহর আমানত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমানতের সাথে খিয়ানত করা জঘন্য অপরাধ। এর মাধ্যমে নারীর ওপর যেকোনো ধরণের দৈহিক বা মানসিক নির্যাতনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রেফারেন্স: (সীরাতে মোস্তফা, মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী, ৩য় খণ্ড)

৬. সীরাতের আলোকে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার: 'উত্তম স্বামী'র মাপকাঠি'

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সাথে রুক্ষ আচরণ করা ইসলামের আদর্শ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে ভালো।"
–(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩৮৯৫)

রাসূল সাঃ এর দাম্পত্য জীবন:
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) ঘরের কাজে তাঁর স্ত্রীদের সাহায্য করতেন এবং হাসিখুশি থাকতেন। তিনি স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন এবং এমনকি আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছিলেন।। তিনি কাপড় সেলাই করতেন, জুতো মেরামত করতেন এবং ঘর পরিষ্কার করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরের কাজে এত বিনয়ী ছিলেন যে, আমাদের প্রয়োজনে আমাদের সাথেই থাকতেন, আবার নামাযের সময় হলে উঠে যেতেন।" এটি প্রমাণ করে যে, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীকেবল ঘরের সেবিকা নয়, বরং সে স্বামীর জীবনের অর্ধাঙ্গিনী এবং প্রধান বন্ধু ও সহচরী।
–(সহীহ বুখারী হাদীস নং- ৬৭৬; সীরাতে ইবনে হিশাম; নারী ও বাস্তবতা)

ইসলাম দাম্পত্য জীবনে নারীকে একদিকে যেমন আর্থিক নিরাপত্তা (মোহর ও খোরপোশ) দিয়েছে, অন্যদিকে তাকে আল্লাহর আমানত' ও 'প্রশান্তির উৎস হিসেবে সর্বোচ্চ মানবিক সম্মান দান করেছে। পাশ্চাত্য নারীবাদ যেখানে নারীকে প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেয়, ইসলাম সেখানে তাকে ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে।

পাঠ ৩.৬: "পারিবারিক নেতৃত্বে ভারসাম্য: তালাক এবং ইদ্দত"

ইসলামী সমাজ ও পরিবার কাঠামোর সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ পুরুষকে দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এটি কোনো স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের নাম নয়, বরং এটি একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব ও সেবামূলক নেতৃত্বের নাম। পাশ্চাত্য নারীবাদ

এবং আধুনিক সেক্যুলার সমাজ এই পরিভাষাটিকে 'লিঙ্গীয় বৈষম্য' হিসেবে উপস্থাপন করলেও, এর গভীরে নিহিত রয়েছে পারিবারিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার এক মহা-দর্শন।

১. কুরআনী দলীল

পবিত্র কুরআনে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার মূলনীতি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

"পুরুষরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল; কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ হতে ব্যয় করে।"
–(সূরা নিসা ৪: ৪)
কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। পৃথিবী ও সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন একজন পরিচালক বা প্রধানের প্রয়োজন হয়, পরিবার নামক ক্ষুদ্রতম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্যও একজন পরিচালকের প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সেই 'ম্যানেজার' বা পরিচালকের দায়িত্ব দিয়েছেন। এটি পুরুষের জন্য কোনো অহংকারের বিষয় নয়, বরং এটি একটি কঠিন দায়বদ্ধতা।
–(পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম)

২. শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপ: লিঙ্গীয় শ্রেষ্ঠত্ব বনাম কার্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব

আয়াতে বর্ণিত 'ফাদদাল্লাহু' (আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন) অংশটি নিয়ে আধুনিক অনেক সংশয় তৈরি করা হয়।
মানবিক সমতা: এখানে শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই নয় যে, পুরুষ আল্লাহর কাছে নারীর চেয়ে বেশি প্রিয় বা বেশি সম্মানী। আল্লাহর কাছে মর্যাদার মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া'।

শারীরিক ও মানসিক গঠন: পরিবার পরিচালনা এবং বহিরাঙ্গনের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য যে শারীরিক শক্তি ও কঠোরতা প্রয়োজন, প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ পুরুষকে তা বেশি দিয়েছেন। অন্যদিকে নারী কোমল ও আবেগপ্রবণ, যা সন্তান লালন-পালন ও গৃহের শান্তির জন্য অপরিহার্য। এই ভিন্নতাই হলো কার্যাগত শ্রেষ্ঠ ।

৩. অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা: নেতৃত্বের মূল্য

আয়াতে দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলা হয়েছে- "যেহেতু তারা তাদের সম্পদ হতে ব্যয় করে।" ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীর মোহরানা, ভরণপোষণ ও যাবতীয় আর্থিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব এককভাবে পুরুষের। যেহেতু পুরুষ এই অর্থনৈতিক ঝুঁকি ও পরিশ্রম গ্রহণ করে, তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই পরিবার পরিচালনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম নারীকে উপার্জনের অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহের অভ্যন্তরীণ 'রানী'র মর্যাদা দিয়েছে।

৪. সীরাতের আলোকে নেতৃত্বের ধরণ: সেবা ও পরামর্শ

নবীজি (সা.)-এর সীরাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর পারিবারিক নেতৃত্ব ছিল দয়া ও পরামর্শভিত্তিক

ঘটনা (উম্মে সালামার পরামর্শ): হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সাহাবায়ে কেরাম মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন, তখন নবীজি (সা.) উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেছিলেন।

বিশ্লেষণ: এটি প্রমাণ করে যে, 'পরিবার' মানে এই নয় যে স্বামী স্ত্রীর ওপর একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে। বরং স্ত্রীর পরামর্শ ও আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তাকে পরিবার পরিচালনা করতে হবে।

নবীজি (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে তার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ।" (সহীহ বুখারী)

৫. 'পরিবার নেতৃত্ব' না থাকলে সমাজের পরিণতি

বিশৃঙ্খলা: পাশ্চাত্য সমাজ পরিবার থেকে পুরুষের এই অভিভাবকত্ব কেড়ে নিয়েছে। ফলে বর্তমানে সেখানে পারিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। ডিভোর্সের হার আকাশচুম্বী এবং শিশুরা পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নারীর ওপর বোঝা: সেখানে নারী ও পুরুষ সমান হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ফলে নারীকে এখন ঘরের কাজের পাশাপাশি বাইরে উপার্জনের জন্য পুরুষের সমান খাটতে হচ্ছে। ইসলাম 'কাওয়াম' ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীকে এই দ্বিমুখী শোষণের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

ইসলামে 'কাওয়াম' হলো পারিবারিক স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচ। এটি নারীকে অবদমিত করার কোনো অস্ত্র নয়, বরং এটি নারীকে নিরাপদ রাখার এক ঐশী গ্যারান্টি। একজন আদর্শ কাওয়াম বা স্বামী হলো স্ত্রীর জন্য একটি সুশীতল ছায়া, যেখানে সে নির্ভয়ে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

৬ .বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ পরবর্তী নারীর সুরক্ষা ও অধিকার

ইসলামী শরীয়তে বিবাহ একটি আমৃত্যু পবিত্র বন্ধন হলেও, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি স্বামী-স্ত্রীর একত্রে থাকা অসম্ভব ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, তবে ইসলাম বিচ্ছেদের পথ খোলা রেখেছে। পাশ্চাত্য দর্শনে যেখানে তালাককে কেবল 'সমাপ্তি' হিসেবে দেখা হয়, ইসলাম সেখানে তালাককে একটি 'অপরিহার্য সমাধান' এবং বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার এক শক্তিশালী কাঠামো দান করেছে।

- **তালাক:** আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ

ইসলাম তালাককে উৎসাহিত করে না, বরং একে একটি চরম ও শেষ পদক্ষেপ হিসেবে পণ্য করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"আল্লাহর নিকট বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় হলো তালাক।" –(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২১৭৮)

বিশ্লেষণ :

ইসলাম তালাককে এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে হুট করে কেউ এই সিদ্ধান্ত নিতে না পারে। এর আগে সালিশি বা পারিবারিক আলোচনার (সূরা নিসা: ০৫) মাধ্যমে মিমাংসার জোর প্রচেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম তালাকের দরজা খোলা রেখেছে যাতে কোনো নারীকে আজীবন কোনো নিষ্ঠুর বা অযোগ্য স্বামীর সাথে শৃঙ্খলিত হয়ে থাকতে না হয়।

- **তালাক প্রদানের পদ্ধতিতে ইসলামের 'সতর্কতা'**

ইসলামে তালাক কেবল একটি শব্দ নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে কুরআন 'পারিবারিক সালিশি' -কে বাধ্যতামূলক করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

"যদি তোমরা তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো..." –(সূরা নিসা ৪: ৩৫)

ইসলাম পারিবারিক বন্ধন রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করার নির্দেশ দেয়। , ইসলাম পরিবার ভাঙাকে নয় বরং সর্বাবস্থায় পরিবার টিকিয়ে রাখাকেই অগ্রাধিকার দেয়।

- **তালাকের পরবর্তী আর্থিক সুরক্ষা: ইদ্দত ও ভরণপোষণ**

ইদ্দত:

তালাকের পর তিন মাস (বা তিন ঋতু) সময় পর্যন্ত নারীকে 'ইদ্দত' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় বিধান নয়, বরং এর পেছনে গভীর হিকমত রয়েছে।

বংশ পরিচয় রক্ষা: ইদ্দতের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে নারী গর্ভবর্তী কি না, যা ভবিষ্যতে সন্তানের অধিকার ও বংশ পরিচয় রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ :

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ

'তাদের স্বামীরা যদি মিমাংসা করতে চায়, তবে এই মেয়াদের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি অধিকার রাখে।" –(সূরা বাকারা২ : ২২৮)
অনেক সময় রাগের মাথায় এক তালাক হয়ে যায়, তাই এই তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে যেন দম্পতি পুনরায় চিন্তা করার ও সুন্দরভাবে ফিরে আসার সুযোগ পায়।

তালাকের পর নারী যেন অকস্মাৎ অসহায় না হয়ে পড়ে, সেজন্য ইসলাম তার অন্ন-বস্ত্র ও আবাসের পূর্ণ দায়িত্ব পূর্বতন স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤ رُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِ نْ كُنَّ اُولَا تِ حَمْلٍ فَاَ نْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِ نْ اَرْضَعْنَ لَـكُمْ فَاٰ تُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ

"('ইদ্দাতকালে) নারীদেরকে সেভাবেই বসবাস করতে দাও যেভাবে তোমরা বসবাস কর তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য তাদেরকে জ্বালাতন করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, তবে তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও। (দুধ পান করানোর ব্যাপারে) ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নাও ।–(সূরা আত্ তালাক ৬৫: ০৬)

- **তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ভরণপোষণ:**

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَا عٌ بِا لْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

"তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।" –(সূরা আল বাকারাহ ২:২৪১)

- **নারীর বিচ্ছেদের অধিকার: 'খুলা' (Khula)**

নারীবাদীরা অভিযোগ করে যে তালাকের ক্ষমতা কেবল পুরুষের। এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল ধারণা। ইসলাম নারীকেও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'খুলা' বলা হয়।

সীরাতের পাতায়:

সাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সাবিতের চরিত্র বা দ্বীনদারী নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু আমি (শারীরিক বা মানসিক কারণে) তাঁর সাথে থাকতে পারছি না।" নবীজি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাঁর দেওয়া বাগানটি (মোহরানা) ফেরত দিতে পারবে?" তিনি রাজি হলেন। তখন নবীজি (সা.) তাঁদের বিচ্ছেদের ফয়সালা করে দিলেন।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, যদি কোনো নারী স্বামীর সাথে অসুখী থাকে, তবে সে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিচ্ছেদ লাভ করতে পারে। ইসলাম নারীকে জোরপূর্বক কারো সাথে থাকতে বাধ্য করেনি।

রেফারেন্স: (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫২৭৩; সীরাতে ইবনে হিশাম)

- **বিচ্ছেদ পরবর্তী সামাজিক মর্যাদা ও পুনর্বিবাহ**

পাশ্চাত্য এবং অনেক গোঁড়া সমাজে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে 'অভিশপ্ত' বা 'অপবিত্র' মনে করা হতো। ইসলাম এই কুসংস্কার ভেঙে দিয়েছে।

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে :

আল্লাহ তাআলা নারীদের স্বাধীন ইচ্ছার মূল্যায়ন করে তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন:

وَاِ ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَا جَهُنَّ اِذَا تَرَا ضَوْا بَيْنَهُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ ؕ

"যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তারপর তাদের ইদ্দৎ পূর্ণ হয়ে যায়, সে অবস্থায় তারা স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না যখন তারা বৈধভাবে উভয়ে আপোষে সম্মত হয়।

–(সূরা আল বাকারাহ ২:২৩২)

বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে :

স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন শেষে নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَا لَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَا جًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَ نْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِ ذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ۗ وَا للّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"

–(সূরা আল-বাকারা,২: ২৩৪)

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর একজন নারীর নিজের জীবন ও পুনর্বিবাহের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আইনগত অধিকার রয়েছে।

নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহ:

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীদের বিবাহ করে সমাজকে দেখিয়েছেন যে এটি লজ্জার নয়, বরং সম্মানের। সীরাতের পাতায় তালাকপ্রাপ্তা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বিবাহ।

সীরাতের ঘটনা:

নবীজি (সা.)-এর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর সাথে জয়নব (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মানসিক মিল না হওয়ায় তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। তৎকালীন আরবে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করাকে অত্যন্ত অমর্যাদাকর মনে করা হতো। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আসমান থেকে এই বিয়ের ফয়সালা করেন-

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

"অতঃপর যায়দ যখন তার (যায়নাবের) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম"। –(সূরা আহযাব ৩৩: ৩৭)।

এই বিবাহের মাধ্যমে ইসলাম দুটি প্রথা ভেঙে দেয়: প্রথমত, পালক পুত্র নিজের সন্তান নয়। দ্বিতীয়ত, তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করা লজ্জার নয় বরং সুন্নাহ। এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ললাট থেকে 'কলঙ্কের তিলক' মুছে দিয়ে তাকে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছেন।
রেফারেন্স:(সীরাতে মোস্তফা, ইদ্রিস কান্ধলভী)

- **সন্তানের অভিভাবকত্ব (Custody) ও দায়বদ্ধতা**

বিচ্ছেদের পর শিশুদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি (সা.) একজন নারীকে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ না তুমি পুনরায় বিবাহ করছো, ততক্ষণ সন্তানের লালন-পালনের হক তোমারই।" তবে সন্তানের যাবতীয় খরচ তখনও পিতাকেই বহন করতে হয়। (সুনানে আবু দাউদ)
পাশ্চাত্য সমাজে নারীবাদী আইনি সংস্কারের ফলে এখন 'No-Fault Divorce' এর প্রচলন হয়েছে, যার ফলে তুচ্ছ কারণে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। এতে নারীরাই সবচেয়ে বেশি আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।নারীবাদ যেখানে তালাককে কেবল শৃঙ্খল মুক্তির পথ বলে প্রচার করে কিন্তু নারীর পরবর্তী সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় না, ইসলাম সেখানে তালাককে কেবল বিচ্ছেদ নয় বরং একটি সুশৃঙ্খল 'এক্সিট রুট' হিসেবে সাজিয়েছে। মোহরানা পরিশোধ, ইদ্দতকালীন খোরপোশ এবং পুনরায় বিবাহের অধিকারের মাধ্যমে ইসলাম প্রমাণ করেছে যে, বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবনেও নারী সমানভাবে সম্মানিত ও সুরক্ষিত।

পাঠ ৩.৮: “বোন ও অন্যান্য নারী আত্মীয়দের অধিকার: আত্মীয়তার বন্ধন ও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি”

ইসলামের পারিবারিক দর্শনে 'সিলাহ রাহমী' বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হয়েছে। এখানে নারী কেবল মা বা স্ত্রী হিসেবেই সম্মানিত নয়, বরং 'বোন', 'ফুফু' কিংবা 'খালা' হিসেবেও সম্মানিত। পাশ্চাত্য নারীবাদ যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দোহাই দিয়ে নারীকে তার পরিবার ও আত্মীয়তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে একা করে দিয়েছে, ইসলাম সেখানে রক্তের সম্পর্কের প্রতিটি বাঁকে নারীকে নিরাপত্তা ও ভালোবাসার এক সুশৃঙ্খল বলয়ে আবদ্ধ করেছে।

১. আত্মীয়তার বন্ধন ও নারীর অধিকার (কুরআনী দলীল)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আত্মীয়দের হক আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاٰ تِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَا لْمِسْكِيْنَ وَا بْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"আর আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও, আর অপব্যয়ে অপচয় করো না।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল১৭: ২৬)

এখানে 'হক' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল দয়া বা করুণা নয়, বরং আত্মীয়দের (বিশেষ করে বোন, ফুফু, খালাদের) প্রাপ্য অধিকার। ইসলামে আত্মীয়তার এই বন্ধনকে 'রাহম' বলা হয়, যা আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রাহমান' থেকে উদ্ভূত। যে এই বন্ধন রক্ষা করে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখেন; আর যে এটি ছিন্ন করে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

২. বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা ও লালন-পালনের সওয়াব
রাসুলুল্লাহ (সা.) বোনদের অধিকার ও মর্যাদাকে জান্নাত লাভের ওসীলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

"যে ব্যক্তির তিনজন কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন রয়েছে, অথবা দুজন কন্যা বা দুজন বোন রয়েছে; সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করল এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করল (অধিকার আদায় করল), তার জন্য রয়েছে জান্নাত।" –(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১৯১২)

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, বোনদের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব কেবল একটি সামাজিক প্রথা নয়, বরং এটি একটি ইবাদত। মুফতী হিফজুর রহমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইসলামে বোনদের ভরণপোষণ এবং বিয়ের পর তাদের খোঁজখবর রাখা ভাইয়ের ওপর নৈতিক ও শারঈ দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করা হয়েছে, যা নারীকে এক আজীবন সামাজিক নিরাপত্তা দান করে।

দুধবোন শায়মার প্রতি নবীজি (সা.)-এর সম্মান
সীরাত ও ইতিহাসের পাতায় বোনের প্রতি সম্মানের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)।
ঘটনা: হুনায়নের যুদ্ধের পর যখন বনী সা'দ গোত্রের কয়েদিদের আনা হলো, তখন তাঁদের মধ্যে নবীজি (সা.)-এর দুধবোন হযরত শায়মা (রা.)-ও ছিলেন। তিনি যখন নিজের পরিচয় দিলেন, নবীজি (সা.) অত্যন্ত আবেগের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নিজের মোবারক চাদরটি জমিনে বিছিয়ে দিয়ে বোনকে সেখানে বসালেন। নবীজির চোখে তখন অশ্রু ছলছল করছিল। তিনি বোনকে সসম্মানে তাঁর গোত্রে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন এবং প্রচুর উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় করলেন।
বিশ্বনবী (সা.)-এর এই আচরণ প্রমাণ করে যে, রক্তের বা দুধের সম্পর্কের বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা প্রদর্শন ইসলামের এক অন্যতম সৌন্দর্য। এটি নারীবাদের সেই রুক্ষ 'অধিকারের লড়াই' নয়, বরং এটি হলো মহব্বত ও ইহসান'-এর এক অনন্য উদাহরণ।
রেফারেন্স: (সীরাতে মোস্তফা, মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী, ৩য় খণ্ড)

৪. খালা ও ফুফুর মর্যাদা: মায়ের বিকল্প ছায়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) খালাদের মর্যাদাকে মায়ের মর্যাদার সমতুল্য করেছেন। জনৈক ব্যক্তি একটি বড় গুনাহ করে নবীজি (সা.)-এর কাছে তওবার পথ চাইলে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি বেঁচে আছেন?" সে বলল, "না।" নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার খালা কি আছেন?" সে বলল, "হ্যাঁ।" নবীজি বললেন, "তবে খালার সেবা করো, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করবেন।"

–(তিরমিযী, হাদীস নং- ১৯০৪)

সারসংক্ষেপ :

দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা কোনো একটি বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম নারীকে তার জীবনের প্রতিটি ধাপে-কন্যা হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ, স্ত্রী হিসেবে প্রশান্তির আধার, মাতা হিসেবে জান্নাতের চাবিকাঠি এবং বোন ও আত্মীয় হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তার সুউচ্চ আসনে বসিয়েছে।

পাশ্চাত্য নারীবাদ নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মক্ষেত্রের অস্থিরতায় পুরুষের 'প্রতিযোগী' বানিয়েছে, কিন্তু ইসলাম নারীকে তার পরিবারের ভেতর 'কেন্দ্রবিন্দু' বানিয়েছে। ইসলামের এই পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারই নারীর জন্য চিরস্থায়ী শান্তি ও সম্মানের একমাত্র পথ। তকী উসমানী সাহেব তাঁর 'পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম' গ্রন্থের শেষে যেমনটি বলেছেন- "পাশ্চাত্য আজ অধিকারের নামে যা হারিয়েছে, ইসলাম তা অনেক আগেই নারীর হাতে আমানত হিসেবে তুলে দিয়েছে।"

৩য় অধ্যায়ের মূল রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ:

- সীরাতে ইবনে হিশাম ও সীরাতে মোস্তফা।
- পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম জাস্টিস তকী উসমানী।
- ইসলামে নারীর মূল্যায়ন মুফতী হিফজুর রহমান।
- ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী।

||চতুর্থ অধ্যায়||

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক অধিকার

পাঠ ৪.১: “সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা ও আর্থিক স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ও শারঈ পটভূমি”

১. ঐতিহাসিক পটভূমি ও তুলনামূলক চিত্র

ইসলাম-পূর্ব যুগে এবং সমসাময়িক প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে নারীর নিজস্ব কোনো অর্থনৈতিক সত্তা ছিল না। নারীকে তখন নিজেই একটি "সম্পত্তি" হিসেবে গণ্য করা হতো, যা উত্তরাধিকার সূত্রে এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত হতো। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার স্ত্রীও পৈত্রিক সম্পত্তির মতো তার পুত্র বা ভাইদের মালিকানায় চলে যেত। নারীর নিজস্ব কোনো আর্থিক সত্তা ছিল না।ইউরোপীয় আইনেও উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বিবাহিত নারীর নিজস্ব সম্পত্তির ওপর একক কোনো অধিকার ছিল না (যেমন যুক্তরাজ্যের Married Women's Property Act 1882-এর পূর্ব পর্যন্ত)।

এই চরম অর্থনৈতিক শোষণের বিপরীতে ইসলাম নারীর পূর্ণ আইনি ও আর্থিক সত্তা প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম নারীর পূর্ণ অর্থনৈতিক ও আইনি সত্তার স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম ঘোষণা করে যে, নারী একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং তার নিজস্ব সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

২. মালিকানার শারঈ ভিত্তি

ইসলামে নারীর সম্পত্তির অধিকার কোনো পুরুষ অভিভাবকের (পিতা, স্বামী বা ভাই) অনুমতির ওপর নির্ভরশীল নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে নারীর অর্থনৈতিক উপার্জনকে তার নিজস্ব অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন:

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩২)

জাহেলী আরবের মানসিকতা ভেঙে ইসলাম এটি স্পষ্ট করেছে যে, ব্যবসার লভ্যাংশ, মহর, উপহার বা যেকোনো বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা পুরুষদের মতোই অকাট্য। এই সম্পত্তিতে পিতা, স্বামী বা ভাইয়ের হস্তক্ষেপ করার কোনো আইনগত অধিকার নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বৈধ পন্থায় উপার্জিত বা প্রাপ্ত যেকোনো সম্পদ (তা ব্যবসা, চাকরি, উপহার বা উত্তরাধিকার যে মাধ্যমেই হোক না কেন) তার ওপর নারীর নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. আর্থিক স্বাধীনতার অনন্য বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীয়তের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও নারীর ওপর পরিবারের ভরণপোষণের কোনো আর্থিক দায়িত্ব চাপানো হয়নি। ইসলামী আইন অনুযায়ী:

বিবাহের পূর্বে কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার।

বিবাহের পর স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের একক দায়িত্ব স্বামীর।নারীর বিশাল সম্পদ থাকলেও পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের । মা বা বোন হলে তার দায়িত্ব যথাক্রমে সন্তান বা ভাইয়ের।

ফলে, নারীর অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদ সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সঞ্চয় হিসেবে থাকে। তিনি চাইলে তা নিজের ইচ্ছামতো বিনিয়োগ করতে পারেন, দান করতে পারেন বা যেকোনো বৈধ কাজে ব্যয় করতে পারেন; স্বামী বা পিতা সেখানে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

মাওলানা তকী উসমানীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এটি নারীকে এক অনন্য আর্থিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্বস্তি প্রদান করে, যা আধুনিক কোনো অর্থব্যবস্থায় দেখা যায় না।

পশ্চিমা নারীবাদ নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে উপার্জনের পেছনে ছুটিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বের দ্বিমুখী বোঝায় পিষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম তাকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিয়ে তার 'মর্যাদা' সুরক্ষিত করেছে।

পাঠ ৪.২: “মিরাস বা উত্তরাধিকার আইনের যৌক্তিক বিশ্লেষণ: নারীর প্রাপ্য ও ইনসাফ”

১. নারীর মিরাস

জাহেলিয়াত বা প্রাক-ইসলামী যুগে নিয়ম ছিল-"যে তরবারি চালাতে পারে না (যুদ্ধ করতে পারে না), সে উত্তরাধিকার পাবে না।" ফলে নারী ও শিশুরা মিরাস থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতো। ইসলাম এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটিয়ে নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে গেছে, তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে গেছে, তাতে নারীদেরও অংশ রয়েছে; তা অল্প হোক বা বেশি হোক-এক নির্ধারিত অংশ।" –(সূরা আন-নিসা, ৪:৭)

এরপর সূরা আন-নিসার **১১** ও **১২** নম্বর আয়াতে কন্যা, মাতা ও স্ত্রীর নির্দিষ্ট অংশগুলো (যেমন: অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. "পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ"-এর অন্তর্নিহিত ইনসাফ :

সমালোচকরা প্রায়শই সূরা নিসার **১১** নম্বর আয়াতের একটি অংশকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে: "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।"বাহ্যিকভাবে এটিকে বৈষম্য মনে হলেও সামগ্রিক ইসলামী অর্থনীতি এবং ইনসাফের দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃত সত্য ফুটে ওঠে:

আর্থিক দায়িত্বের ভারসাম্য:

একজন পুরুষ মিরাস থেকে যা পায়, তা থেকে তাকে নিজের, স্ত্রীর, সন্তানদের এবং অনেক সময় অভাবী আত্মীয়দের ভরণপোষণ করতে হয়। অন্যদিকে, একজন নারী যা

পায়, তা সম্পূর্ণ তার একক মালিকানায় থাকে। তার সম্পত্তি থেকে কাউকে এক টাকাও দেওয়ার বাধ্যবাধকতা শরীয়তে নেই।ফলে গাণিতিকভাবে পুরুষ বেশি পেলেও বাস্তব খরচের পর নারীর সঞ্চয়ই বেশি থাকে।

বাস্তবিক একটা উদাহরণ : ধরা যাক, এক ভাই ও এক বোন উত্তরাধিকার সূত্রে মোট ৩,০০০ টাকা পেলেন। নিয়ম অনুযায়ী ভাই পাবেন ২,০০০ টাকা এবং বোন পাবেন ১,০০০ টাকা। বাহ্যিকভাবে ভাই বেশি পেলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, বোন এই ১,০০০ টাকা সম্পূর্ণ নিজের কাছে জমিয়ে রাখতে পারবেন। আর ভাইকে তার প্রাপ্ত ২,০০০ টাকা থেকে নিজের ও তার স্ত্রীর পেছনে খরচ করতে হবে। ফলে দিনশেষে বোনের আর্থিক অবস্থা ভাইয়ের চেয়েও বেশি সুসংহত থাকে।

নারী সব সময় অর্ধেক পায় না:

ফারায়িজ (উত্তরাধিকার) আইনের গভীর পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারী মাত্র ৪টি অবস্থায় পুরুষের অর্ধেক পায়। কিন্তু প্রায় ৩০টিরও বেশি অবস্থায় নারী পুরুষের সমান অংশ পায়, অথবা পুরুষের চেয়ে বেশি পায়, কিংবা নারী অংশ পেলেও দূরবর্তী পুরুষ আত্মীয়রা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় (যেমন: নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মা ও বাবার সমান অংশ পাওয়া, কিংবা বৈমাত্রেয় বোনের উপস্থিতিতে দূরবর্তী পুরুষ আত্মীয়ের বঞ্চিত হওয়া)। সুতরাং, দ্বিগুণ পাওয়ার বিষয়টি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।

পাঠ ৪.৩: “জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষার অধিকার”

হাদীসে বর্ণিত শিক্ষার ফরযিয়্যাত ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর ইলমী অবদান

মানব সভ্যতার বিকাশ এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা শ্রেণীর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করেনি।

১. পবিত্র কুরআনের আলোতে নারীর শিক্ষার অধিকার

ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল জ্ঞানার্জন সংক্রান্ত—

اِقْرَأْ بِا سْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" –(সূরা আলাক ৯৬: ১)

এই আদেশটি সামগ্রিকভাবে নর-নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَا لَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗاِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَ لْبَا بِ

“ বলো- যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে” –(সূরা যুমার ৩৯: ৯)

এখানে জ্ঞানীদের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাতে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য করা হয়নি।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বারবার 'আফালা তাতাফাক্কারুন' (তোমরা কি চিন্তা করো না?) বা 'আফালা তা'কিলুন' (তোমরা কি অনুধাবন করো না?) বলে মানবজাতিকে চিন্তা ও গবেষণার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তাতে মুসলিম নারীরাও সমভাবে অন্তর্ভুক্ত।

২. হাদীস শরীফের আলোকে শিক্ষার সর্বজনীন ফরযিয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নারীর জন্য একটি ধর্মীয় আবশ্যকীয় কর্তব্য বা ফরয।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।"

–(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২২৪; সহীহ সনদ)।

আরবী ব্যাকরণগত নিয়ম অনুযায়ী 'মুসলিম' শব্দটি এখানে 'মুসলিমাহ' (নারী)-সহ সমগ্র উম্মতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল সাধারণ নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং নারীদের দ্বীনী ও জাগতিক শিক্ষার জন্য বিশেষ দিন নির্ধারণ করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন, "যার ঘরে কোনো কন্যা সন্তান থাকে, আর সে তাকে উত্তম শিক্ষা ও আদব কায়দা শেখায়... তবে সেই কন্যা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির অন্তরায় (ঢাল) হবে।" (সহীহ বুখারী)।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে

হাফেজ ইবনে হিশাম সংকলিত বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতে ইবনে হিশাম' এবং অন্যান্য সীরাত সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নারীদের শিক্ষার এক অভূতপূর্ব পরিবেশ ছিল।

মদীনার আনসার ও মুহাজির নারীরা দ্বীন শেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। তারা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষদের কারণে আমরা আপনার মজলিসে বসার সুযোগ পাই না। অতএব, আমাদের শিক্ষার জন্য আপনি একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সপ্তাহে একটি দিন শুধু নারীদের কোরআন, সুন্নাহ ও মাসআলা-মাসায়েল শেখানোর জন্য বরাদ্দ করেন।

৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ইলমী অবদান ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা

ইসলামে নারী শিক্ষার সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রমাণ হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)। তৎকালীন আরব সমাজে তিনি ছিলেন সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান: তিনি একাই ২,২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম বৃহৎ ভাণ্ডার। তিনি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মুফতি এবং ফকীহ ছিলেন।

বড় বড় সাহাবীগণ (রা.) যখন কোনো জটিল ফিকহী, আইনি বা মিরাসের সমস্যায় পড়তেন, তখন তারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর শরণাপন্ন হতেন এবং তিনি তার নিখুঁত সমাধান করে দিতেন।

বহুমাত্রিক জ্ঞান: তিনি কেবল হাদীস বা ফিকহ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন না; বরং আরবী সাহিত্য, ইতিহাস, বংশলতিকা এবং তৎকালীন চিকিৎসা শাস্ত্রেও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, "যদি সমস্ত মানুষের জ্ঞান এবং নবীজির

অন্য সব স্ত্রীদের জ্ঞান এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে আয়েশার জ্ঞান অপর পাল্লায় ভারী হবে।"

ইসলাম নারীকে শিক্ষার যে অধিকার দিয়েছে, তা কোনো সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। পবিত্র কুরআন, সীরাতে ইবনে হিশাম এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর জীবনীর আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই নারীকে শিক্ষার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে তার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে তার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক 'মর্যাদা' নিশ্চিত করেছে।

পাঠ ৪.৪: "কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ: শারঈ শর্তাবলী, শালীনতা রক্ষা ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা"

১. পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য

মানব ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে নারীর নিজস্ব কোনো পেশাগত বা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজগুলোতে নারীর শ্রমকে কেবল গৃহস্থালি দাসত্ব হিসেবে দেখা হতো। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাও নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরের বাইরে এনেছে বটে, তবে তা মূলত সস্তা শ্রমের বাজার সৃষ্টি এবং নারীর ওপর বাধ্যতামূলক জীবিকা অর্জনের দ্বিমুখী সামাজিক বোঝা চাপানোর নামান্তর।

এর বিপরীতে, ইসলাম নারীকে তার মেধা, যোগ্যতা ও শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণ পবিত্র ও হালাল উপায়ে কর্মসংস্থানের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়েছে। চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা কুটির শিল্পের মতো উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ ইসলামের ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই স্বীকৃত। ইসলামী ফিকহ ও আইনব্যবস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, নারীকে পেশা বা কর্মসংস্থানের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও, তার ওপর নিজের বা পরিবারের ভরণপোষণের ন্যূনতম আর্থিক দায়িত্ব

চাপানো হয়নি। ফলে নারীর জন্য কর্মসংস্থান কোনো বাধ্যতামূলক দাসত্ব বা সামাজিক চাপ নয়, বরং এটি তার একটি ঐচ্ছিক ও মর্যাদাপূর্ণ অধিকার।

২. কর্মক্ষেত্রের শারঈ শর্তাবলী ও পর্দা , শালীনতা

ক.হিজাব ও শালীনতা রক্ষা:

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম একটি সুনির্দিষ্ট, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের রূপরেখা প্রদান করে, যা নারীর মানবিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে এবং সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। এই সুরক্ষাবলয়ের মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক হিজাব ও শালীনতার বিধান। কর্মস্থলে পোশাক ও আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামী শালীনতা বজায় রাখা আবশ্যকতা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সামাজিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মিথস্ক্রিয়ার নিয়ম বেঁধে দিয়ে ইরশাদ করেন:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ....وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।... এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ পেয়ে থাকে তা ছাড়া..." –(সূরা আন-নূর, ২৪:৩১)

কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক পরিমণ্ডলে যখন নারী ও পুরুষকে কোনো যৌথ বা সমান্তরাল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তখন প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো উভয় পক্ষকেই নিজ নিজ দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে। নারীরা তাদের বহিরাঙ্গনের স্বাভাবিক শালীন পোশাক (যা আবৃত করার পরও বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়) ব্যতীত কোনো প্রকার কৃত্রিম সাজসজ্জা বা শরীরের অবয়ব পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করবে না। এই বিধান নারীকে কর্মস্থলে একটি ভোগ্যপণ্য বা যৌনতার প্রতীক হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। এটি তাকে

একজন মানুষ এবং একজন পেশাদার কর্মী হিসেবে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রকৃত মর্যাদা দেয়। পশ্চিমা আধুনিক সমাজ নারীকে স্বাধীনতার নামে কর্মক্ষেত্রে যে কায়িক ও মানসিক শোষণের মুখোমুখি করেছে, ইসলাম তার হিজাব ও শালীনতার বিধানের মাধ্যমে সেই শোষণকে চিরতরে বন্ধ করেছে।

খ.পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য:

কর্মজীবন যেন নারীর মূল তাত্ত্বিক দায়িত্ব-অর্থাৎ মাতৃত্ব ও পারিবারিক শৃঙ্খলাকে ধ্বংস না করে। জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানীর মতে, পশ্চিমা সমাজ নারীকে ঘরের বাইরে এনে সফল করলেও তার ঘরের শান্তি ও মাতৃত্বের মর্যাদাকে হরণ করেছে, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৩. ইসলামের স্বর্ণযুগে নারী সাহাবীগণের কর্মজীবন ও স্বাবলম্বিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র যুগে এবং খিলাফতে রাশেদার আমলে মুসলিম নারীদের কর্মস্পৃহা ও স্বাবলম্বিতার অসংখ্য বাস্তব ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে।

ব্যবসা ও বিনিয়োগ: ইসলামের ইতিহাসের প্রথম নারী এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম শীর্ষ ধনী ও সফল ব্যবসায়ী। তিনি নিজে কাফেলা নিয়ে সশরীরে মরুভূমি পাড়ি দিতেন না, বরং পুরুষদের (যেমন রাসূলুল্লাহ সা.)তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে পুঁজি বিনিয়োগ করতেন, যা ইসলামী অর্থনীতিতে 'মুদারাবা' পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

কৃষিকাজ ও শারীরিক শ্রম:

খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রথমা কন্যা হযরত আসমা (রা.) খাইবার বিজয়ের পর প্রাপ্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দেওয়া দূরবর্তী জমিতে সরাসরি চাষাবাদের কাজ তদারকি করতেন। তিনি নিজের মাথায় করে ভারী খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসতেন এবং নিজ হাতে ঘোড়াকে ঘাস-পানি দিয়ে খামারের দেখভাল করতেন। –(সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ,হাদীস নং ৫২২৪)।

কারুশিল্প ও উৎপাদনশীলতা:

হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.) সুতা কাটার কাজ করতেন এবং তা বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করতেন।

তৎকালীন মদীনার বহু নারী সুতা কাটা, কাপড় বোনা এবং পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের মতো কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা এই স্বাধীন শ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছামতো পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয় করতেন। ইসলাম এই শ্রমগুলোকে কেবল আইনি বৈধতাই দেয়নি, বরং শালীনতার সীমানায় থেকে নারীর এই কর্মদক্ষতাকে সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে।

পাঠ ৪.৫: “সমাজ বিনির্মাণ ও দাওয়াতি কাজে নারীর ভূমিকা: কাজের আদেশ ও সামাজিক খিদমত”

১. সমাজ সংস্কারে নারীর ধর্মীয় ও আইনি দায়বদ্ধতা

উগ্র আধুনিকতাবাদী ও ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডায় প্রায়শই দাবি করা হয় যে, ইসলাম নারীকে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে চার দেয়ালের মাঝে অবরুদ্ধ করেছে। অথচ চৌদ্দশত বছর আগে পবিত্র কুরআন সমাজ বিনির্মাণ, শাসন এবং সামাজিক সংস্কারের গুরুদায়িত্ব পুরুষ ও নারীর ওপর সমভাবে সমান্তরালভাবে অর্পণ করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمزون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।"

–(সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ৭১)

আয়াতে ব্যবহৃত 'উলাইয়া' (পারস্পরিক বন্ধুত্ব, অভিভাবকত্ব ও সহযোগিতা) শব্দটির মূল রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থ হলো-সমাজ থেকে অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় দূর করতে নারী ও পুরুষ একে অপরের হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। নারীরা কেবল নিজেদের গৃহের অভ্যন্তরেই সৎ কাজের চর্চা করবে না, বরং সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দ্বীনি দাওয়াতের বৃহত্তর ময়দানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।আধুনিক কোনো দর্শন বা মতবাদ নারীকে সামাজিক দায়িত্ববোধের যে উচ্চ আসন ও আইনি অধিকার দিয়েছে, ইসলাম তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সামাজিক ব্যাধি ও কুসংস্কার দূরীকরণে পুরুষের চেয়ে নারীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর। একটি আদর্শ সমাজ গঠনে মায়ের ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি সমাজের অন্যান্য নারীদের নৈতিক অবক্ষয় রোধে একজন সচেতন নারীর দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক ভূমিকা অপরিহার্য। ইসলাম নারীকে সমাজ বিনির্মাণের এই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

২. যুদ্ধক্ষেত্রে এবং আপদকালীন চিকিৎসায় নারী সাহাবীগণের অবদান

সীরাতে ইবনে হিশাম এবং হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রমাণ করে যে, সামাজিক ও জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে নারী সাহাবীগণ ঘরের কোণে বসে না থেকে সরাসরি ময়দানে অবদান রেখেছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ও রসদ সরবরাহ: গাযওয়া বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ময়দানে আহত সৈনিকদের পানি পান করানো এবং তলোয়ারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সাহাবীদের চিকিৎসার জন্য নারী সাহাবীগণ বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্প বা তাঁবু স্থাপন করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা তাঁবু পাহারা দিতেন, খাবার রান্না করতেন এবং আহত ও অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন।

ইসলামের প্রথম সামরিক সার্জন: হযরত রুফাইদাহ আল-আসলামিয়া (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম নিবন্ধিত নারী চিকিৎসক ও সার্জন। খন্দকের যুদ্ধের সময়

মদীনার মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁর একটি সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ তাঁবু ছিল, যেখানে তিনি আহত সাহাবীদের জটিল অস্ত্রোপচার ও দীর্ঘমেয়াদী নিবিড় চিকিৎসা প্রদান করতেন।

৩. বাজার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক খিদমত

ইসলামী সমাজের আইন-শৃঙ্খলা ও ব্যবসায়িক সততা বজায় রাখতে নারীর মেধা ও যোগ্যতার রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ খিলাফতে রাশেদার আমল থেকে পাওয়া যায়। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে মদীনার প্রধান বাজারের বাণিজ্যিক শৃঙ্খলা, ওজন ব্যবস্থা এবং হালাল-হারাম লেনদেন তদারকির জন্য 'হযরত শাফা বিনতে আব্দুল্লাহ' (রা.) নাম্নী এক বিদুষী, শিক্ষিত ও কঠোর ব্যক্তিত্বের নারীকে "মার্কেট ইন্সপেক্টর" বা বাজার পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। কোনো ব্যবসায়ী জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে তিনি রাষ্ট্রীয় চাবুক দিয়ে শাস্তির বিধানও কার্যকর করার প্রশাসনিক ক্ষমতা রাখতেন। এটি প্রমাণ করে যে, সমাজ বিনির্মাণে নারীর সামাজিক ও প্রশাসনিক খিদমতকে ইসলাম কত বড় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

পাঠ ৪.৬: "রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে নারীর পরামর্শের গুরুত্ব: উম্মে সালামা (রা.) ও ইসলামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা"

১. ইসলামী রাজনীতি ও শুরা (পরামর্শ) ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে নারীদের ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক মত প্রকাশের ন্যূনতম অধিকার পেতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করতে হয়েছে। অথচ ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতেই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার মূল নীতি হিসেবে 'শুরা' বা পারস্পরিক পরামর্শ ব্যবস্থায় নারীর কণ্ঠস্বর ও মতামতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(وأمزهم شورى بينهم

"এবং তাদের রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।"
–(সূরা আশ-শূরা ৪৩: ৩৮)

এই 'তাদের' শব্দের মধ্যে পুরুষ ও নারী সমাজ উভয়ই সমভাবে অন্তর্ভুক্ত।ইসলামী আইনশাস্ত্রে নারীর রাজনৈতিক মতামত কেবল আলংকারিক নয়, বরং তা নীতি নির্ধারণে বড় ধরনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বা আপদকালীন সংকট মোচনে নারীর মনস্তাত্ত্বিক ও কৌশলী চিন্তাভাবনাকে ইসলাম কীভাবে মূল্যায়িত করেছে, তা পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত।

২. হুদাইবিয়ার সন্ধি ও উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.)-এর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

প্রেক্ষাপট : মক্কার কুরাইশদের সাথে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে যাওয়ায় সাহাবীগণ (রা.) চরম মানসিক কষ্ট ও ক্ষোভে ভুগছিলেন। সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের তিনবার নির্দেশ দিলেন: "তোমরা ওঠো, তোমাদের কুরবানীর পশু যবেহ করো এবং মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলো।" কিন্তু সাহাবীগণ তীব্র মনোকষ্টের কারণে কেউ নিজের স্থান থেকে নড়লেন না। ইসলামের ইতিহাসে সাহাবীগণ কর্তৃক রাসূলের নির্দেশ পালনে এমন স্থবিরতা আর কখনো দেখা যায়নি।
সংকট মোচনে উম্মুল মুমিনীনের ভূমিকা: এই জটিল ও নাজুক পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে এই কঠিন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান তারা নির্দেশ পালন করুক? তাহলে আপনি বাইরে যান, কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজেই আপনার কুরবানীর পশুটি যবেহ করুন এবং আপনার নাপিতকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন।

ফলাফল:" রাসুলুল্লাহ (সা.) এই পরামর্শ অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বাইরে গিয়ে ঠিক তা-ই করলেন। আল্লাহর রাসূলকে নিজে আমল করতে দেখে সাহাবীগণের মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল এবং তারা দ্রুত উঠে প্রত্যেকে নিজের পশু কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করতে লাগলেন ।
–(সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরুত; হাদীস নং: ২৭৩১-২৭৩২)

একটি বিশাল রাষ্ট্রের এবং উম্মাহর এই চরম সংকটময় মুহূর্তে একজন নারীর রাজনৈতিক পরামর্শে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যা প্রমাণ করে ইসলামে নারীর নীতিনির্ধারণী মতামত কতখানি শক্তিশালী।

৩. রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ও সত্যের আইনি স্বীকৃতি

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের বিয়ের মহরানার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ও সীমিত করার রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ জারি করতে চাইলেন, যাতে যুবকদের বিয়ে সহজ হয়। ঠিক তখন কুরাইশ বংশের এক সাধারণ নারী মসজিদের পেছনের কাতার থেকে দাঁড়িয়ে খলীফাকে সরাসরি আইনি চ্যালেঞ্জ করে বললেন, "হে উমর! আপনি এটি করতে পারেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা যেখানে কুরআন মাজীদে বলেছেন- 'তোমরা যদি তাদের স্তূপীকৃত সম্পদও মহর হিসেবে দিয়ে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না' (সূরা নিসা: ২০), সেখানে আপনি তা সীমিত করার আইন করার কে?"

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) এই নারীর রাজনৈতিক ও আইনি যুক্তি শুনে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হননি, বরং জনসমক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করে ঐতিহাসিক বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন: "এক নারী সত্য বলেছে, আর উমর ভুল করেছে।" এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন সাধারণ নারীও দেশের সর্বোচ্চ থামকের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের ভুল ধরে তা সংশোধন করার পূর্ণ রাজনৈতিক ও আইনি অধিকার রাখতেন

পাঠ ৪.৭: “নারী শ্রমের মর্যাদা: কারুশিল্প ও উপার্জনে মুসলিম নারীদের দৃষ্টান্ত”

১. শ্রমে ইসলামের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মমর্যাদা

আধুনিক অর্থনৈতিক দর্শনগুলোতে শ্রমকে প্রায়শই কেবল উৎপাদনশীলতা ও বস্তুগত মুনাফার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। যেখানে জেন্ডার পে-গ্যাপ বা লিঙ্গভিত্তিক মজুরি

বৈষম্য একটি বড় সংকট।ফলে পুজিবাদী অর্থব্যবস্থায় নারী শ্রমকে একটি সস্তা শ্রমবাজারের হাতিয়ারে রূপান্তর করা হয়েছে। এর বিপরীতে, ইসলামে যেকোনো বৈধ কায়িক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ লিঙ্গহীন এবং এটি সরাসরি পরকালীন ইবাদত ও আত্মমর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন:

بعض أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم م

"আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমলই নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী; তোমরা একে অপরের অংশ।" –(সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৯৫)

এই আয়াতের মর্মার্থ হলো, দুনিয়াবী ও দ্বীনি-যেকোনো বৈধ, হালাল ও জনকল্যাণমূলক কর্মপ্রচেষ্টা বা শ্রমের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধান নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য করে না। পুরুষ তার সৎ শ্রমের জন্য যেভাবে পুরস্কৃত ও মূল্যায়িত হবে, নারীও তার মেধা ও শারীরিক শ্রমের জন্য সমানভাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে। ইসলাম নারীকে যে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তা তাকে সমাজে পরনির্ভরশীল হওয়া থেকে রক্ষা করে আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেয়। –(তাফসীরে ইবনে কাসীর; খণ্ড: ২,)

২. কারুশিল্প, কুটির শিল্প ও স্বাবলম্বিতায় নারী সাহাবীদের অবদান

ইসলামের সোনালী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, প্রাথমিক ইসলামী সমাজে মুসলিম নারীরা ঘরে বসে কেবল অলস সময় অতিবাহিত করতেন না। তারা সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অত্যন্ত নিপুণ কারুশিল্পী, হস্তশিল্পী ও উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হযরত যাইনাব বিনতে জাহশ (রা.)-এর উন্নত চামড়া শিল্প ও দানশীলতা: ইসলামের ইতিহাসে হস্তশিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত যাইনাব বিনতে জাহশ (রা)। তিনি নিজ ঘরে পশুর চামড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত বা পাকা করার কাজ করতেন। এরপর সেই চামড়া কেটে অত্যন্ত চমৎকার ব্যাগ, পাদুকা ও বিভিন্ন ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করতেন। এছাড়াও তিনি

সুই-সুতার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিপুণ সূচিকর্ম বা সেলাইয়ের কাজ করতেন। এই কঠিন কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় করতেন না, বরং মদীনার দরিদ্র, ইয়াতিম ও অভাবী মানুষের কল্যাণে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতেন। তাঁর এই শ্রমশীলতা ও দানশীলতার প্রশংসা করে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন,

"তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার সাথে পরকালে সবার আগে মিলিত হবে, যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ (অর্থাৎ যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী ও দাতা)।"

–(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা; হাদীস নং: ২৪৫২)

বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ: সীরাতের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, বহু নারী সাহাবী নিজস্ব উদ্যোগে আতর (সুগন্ধি) ও ঔষধি উপাদান তৈরি ও বিক্রির ব্যবসা করতেন। হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা) সুতা কাটার কারুশিল্পে এত বেশি দক্ষ ছিলেন যে, তৎকালীন মদীনার কাপড়ের বাজারে তাঁর তৈরি সুতার বিশেষ গুণগত মান ও বাণিজ্যিক চাহিদা ছিল। ইসলাম নারীদের এই অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও কারুশিল্পকে শুধু আইনি বৈধতাই দেয়নি, বরং সমাজ বিনির্মাণে তাদের এই অবদানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃতি দিয়েছে। –(সীরাতে ইবনে হিশাম; খণ্ড: ৪)

৩. আধুনিক পুজিবাদী শোষণ বনাম ইসলামের সুরক্ষার তত্ত্ব

নারী শ্রমের আধুনিক রূপ এবং ইসলামের সুরক্ষামূলক আইনের মাঝে একটি বিশাল মনস্তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে। সমকালীন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের গভীর বিশ্লেষণে এই স্বাতন্ত্র্যটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

শ্রমের স্বাধীনতা বনাম আধুনিক শ্রমের দাসত্ব: পশ্চিমা পুঁজিবাদী সভ্যতা নারীবাদকে ব্যবহার করে নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চটকদার প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু এর আড়ালে তারা মূলত কর্পোরেট দুনিয়ায় সস্তা শ্রমের একটি বড় বাজার তৈরি করেছে। আধুনিক বিশ্ব নারীকে টাইপিস্ট, রিসেপশনিস্ট, বিপণন কর্মী বা কলকারখানার শ্রমিক বানিয়ে তাকে কঠোর শারীরিক ও মানসিক শ্রমে বাধ্য করেছে। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, বাইরে এই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটার পরও নারীকে ঘরের ভেতরের মাতৃত্ব, সন্তান

লালন-পালন ও পারিবারিক দায়িত্বও একাই সামলাতে হচ্ছে। একে সমাজবিজ্ঞানীরা নারীর ওপর "দ্বিমুখী শোষণ" বা আধুনিক শ্রমের দাসত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলামের 'মর্যাদা': পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীর শ্রমকে তার জন্য একটি 'ঐচ্ছিক সম্মান' বা মেধা বিকাশের স্বাধীনতা হিসেবে রেখেছে, একে কোনো প্রকার 'বাধ্যবাধকতা' বা বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর লড়াই বানায়নি। ইসলাম নারীকে কারুশিল্প, শিক্ষা বা ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পদের একক মালিকানা দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে, তার ওপর নিজের বা পরিবারের ভরণপোষণের এক পয়সার দায়িত্বও শরীয়ত চাপায়নি। ইসলামী আইন (نفقة) অনুযায়ী স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার বহনের একক দায়িত্ব পুরুষের।

সুতরাং, ইসলামে নারী শ্রমের প্রকৃত অর্থ হলো-নারী যদি কোনো কাজ বা কারুশিল্প করে, তবে সেই উপার্জিত সম্পূর্ণ অর্থ তার নিজস্ব নিরাপদ সঞ্চয় ও সামাজিক সম্মান। জীবিকা নির্বাহের কঠিন তাগিদে তাকে ঘরের বাইরে এসে পুরুষের সাথে কোনো প্রকার অসম ও মর্যাদাহানিকর প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না। এটিই হলো পশ্চিমা নারীবাদের তথাকথিত শোষিত 'অধিকার'-এর বিপরীতে ইসলামের দেওয়া প্রকৃত 'মর্যাদা ও মূল্যায়ন'।
রেফারেন্স: পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম; পৃষ্ঠা: ৭৫-৮২,ইসলামে নারীর মূল্যায়ন; পৃষ্ঠা: ১৯৮-২০৫ ,ইসলামে নারী; পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৮।

||৫ম অধ্যায়||

“নারীবাদের নেতিবাচক প্রভাব বনাম কুরআনিক সমাধান”

পাঠ ৫.১: “পারিবারিক কাঠামোর ধ্বংসস্তূপ: ডিভোর্স ও পরিবার ভাঙ্গনের ভয়াবহতা”

১. পারিবারিক ব্যবস্থার পতন ও উগ্র নারীবাদের ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং মৌলিক একক হিসেবে পরিবার প্রথা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে শিল্প বিপ্লবের পর এবং বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে উগ্র নারীবাদের উত্থানের ফলে এই সনাতন পারিবারিক ব্যবস্থার মূলে চরম কুঠারাঘাত করা হয়। উগ্র নারীবাদী দর্শনে প্রথাগত পরিবার কাঠামোকে নারীর জন্য একটি 'কারাগার' এবং পুরুষতান্ত্রিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা দাবি করে, নারীর প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে মাতৃত্বের বন্ধন ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে।

এই কৃত্রিম দর্শনের অন্ধ অনুকরণে পশ্চিমা সমাজ প্রকৃতির অমোঘ বিধান ও জৈবিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা নারী ও পুরুষকে পরস্পরের 'পরিপূরক' ভাবার পরিবর্তে পরস্পরের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যার সরাসরি পরিণতি হিসেবে পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থায় এক চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। পরিবার প্রথা আজ সেখানে এক গভীর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, যা তাদের পুরো সামাজিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

২. তাবাররুজ (বেপর্দা/প্রদর্শনীবাদ) এবং স্বামী-স্ত্রীর মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব

একটি সুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবারের মূল ভিত্তি হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা এবং গভীর মানসিক সংযুক্তি। যখন কোনো সমাজে নারীর

'ইহতিশাম' (শালীনতা ও আত্মমর্যাদা) লোপ পায় এবং 'তাবাররুজ' (অনিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্য প্রদর্শন বা প্রদর্শনীবাদ) প্রধান সংস্কৃতিতে রূপ নেয়, তখন তার প্রথম ও প্রধান আঘাতটি আসে বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর।

বাইরের জগতে অবাধ মেলামেশা এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শনীবাদ সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বে এক স্থায়ী অতৃপ্তি ও কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পবিত্র ও একনিষ্ঠ ভালোবাসা খণ্ডিত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ভোগবাদ ও কর্পোরেট বিশ্ব নারীকে একটি পণ্য হিসেবে বাজারে উপস্থাপন করায়, পারিবারিক জীবনের চেয়ে বাইরের চাকচিক্য, প্রশংসা এবং ক্যারিয়ারের অন্ধ প্রতিযোগিতাই নারীর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঘরকে তখন তাদের কাছে একঘেয়ে ও বন্দিদশা মনে হয়। ফলশ্রুতিতে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ছাড় ও পরমতসহিষ্ণুতার অভাব দেখা দেয়, যা পরিবার ভাঙনের এবং বিবাহবিচ্ছেদের (Divorce) হার জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে দেওয়ার মূল কারণ।

৩. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অভিশাপ: ব্রোকেন হোম ও সিঙ্গল মাদারহুড

আধুনিক পশ্চিমা সমাজ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যার মূল কথা হলো 'আমার জীবন, আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত'। যেখানে কেবল 'আমি' বা 'আমার অধিকার' মুখ্য, সেখানে 'আমাদের পরিবার' বা 'আমাদের সন্তান' টিকে থাকতে পারে না। কারণ, একটি সুখী পরিবার গড়ে ওঠে পারস্পরিক আত্মত্যাগ ও সমঝোতার ভিত্তিতে, যা উগ্র নারীবাদী চিন্তাধারা কখনোই শিক্ষা দেয় না।

এই চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যে বিয়ে ছাড়াই লিভ-ইন পার্টনারশিপের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান এবং পরবর্তীতে তুচ্ছ কারণে বিচ্ছেদের ঘটনা একটি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। এর ফলে লাখ লাখ শিশু আজ 'ব্রোকেন হোম' (ভাঙা পরিবার) অথবা 'সিঙ্গল মাদারহুড' (একক মাতৃত্ব)-এর করাল গ্রাসে পতিত হচ্ছে। বাবা-মায়ের স্নেহবঞ্চিত এই শিশুরা চরম মানসিক বিকারগ্রস্ততা, একাকীত্ব এবং অপরাধপ্রবণতায় ভুগছে, যা পশ্চিমা অপরাধবিজ্ঞানের একটি বড় উদ্বেগের কারণ। অন্যদিকে, যৌবনে অন্ধ ক্যারিয়ার ও উপার্জনের পেছনে ছুটে পরিবার গঠন না করা নারীরা যখন বার্ধক্যে পৌঁছায়, তখন তারা চরম একাকীত্বের মুখোমুখি হয়। পশ্চিমা সমাজ তাদের ছুঁড়ে ফেলে বৃদ্ধাশ্রমে, যেখানে মাসের পর মাস তাদের

খোঁজ নেওয়ার মতো কোনো আপনজন থাকে না। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার এটিই সবচেয়ে বড় মানবিক ট্র্যাজেডি।

৪. পারিবারিক শান্তিতে কুরআন

পাশ্চাত্যের এই পচনশীল পারিবারিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম পরিবারকে কেবল একটি আইনি বা বস্তুগত চুক্তি হিসেবে দেখে না। বরং একে মানবাত্মার পরম শান্তি, প্রশান্তি ও নিরাপত্তার নীড় হিসেবে গণ্য করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা পারিবারিক বন্ধনের এই অলৌকিক সৌন্দর্য তুলে ধরে ইরশাদ করেন:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি (সুকুন) পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" –(সূরা আর-রুম, ৩০: ২১)

তাফসীর বিশ্লেষণ: এই আয়াতের গভীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, 'সুকুন' বা মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি তখনই সম্ভব, যখন স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে নিজ নিজ শারঈ দায়িত্ব ও প্রকৃতির দেওয়া ভূমিকা বা সীমানা মেনে চলে। স্ত্রী যখন মাতৃত্বের মমতা দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুশোভিত ও শান্ত রাখে এবং স্বামী যখন বাইরের কঠোর পরিশ্রম করে স্ত্রীর আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তখনই তাদের মাঝে 'মাওয়াদ্দাহ' (গভীর আবেগীয় ভালোবাসা) এবং 'রাহমাহ' (পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি) জাগ্রত হয়। পশ্চিমা সমাজ এই প্রাকৃতিক শ্রম বিভাজনকে অস্বীকার করে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় পুরুষ ও নারীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যার ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া উধাও হয়ে সেখানে জন্ম নিয়েছে ক্ষোভ, হিংসা ও চিরস্থায়ী পারিবারিক অশান্তি । (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

৫. পরিবার ধ্বংসের শয়তানি এজেন্ডা এবং সতর্কতা

ইসলামী শরীয়তে পরিবার রক্ষা করাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পরিবার ভেঙে দেওয়া যে শয়তানের প্রধান লক্ষ্য, তা সহীহ হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إن إبليس يضع عرشة على الماء ثم يبعث سراياة ...ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركتة حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت

"নিশ্চয়ই ইবলিস পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর সে মানবসমাজে তার সৈন্যদল পাঠায় (কুপ্ররোচনা দেওয়ার জন্য)।... তাদের মধ্যে একজন এসে বলে, 'আমি অমুক দম্পতির পিছু ছাড়িনি, যতক্ষণ না তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ (ডিভোর্স) ঘটিয়ে দিয়েছি।' তখন ইবলিস তাকে নিজের খুব কাছে টেনে নেয় এবং বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই আসল কাজ করেছ" !
–(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা; হাদীস নং: ২৮১৩)

সীরাহ পাতায় আলোকপাত: রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার সমাজ গঠনের প্রথম দিন থেকেই পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়েছিলেন। কারণ পরিবার ধ্বংস হলে পুরো সমাজ ভেঙে পড়ে। আধুনিক পশ্চিমা উগ্র নারীবাদ অবিকল ইবলিসের এই এজেন্ডাটিই অবচেতনভাবে বাস্তবায়ন করছে। তারা অধিকারের চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে তুচ্ছ কারণে নারীকে স্বামীর বিরুদ্ধে এবং স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কে দিচ্ছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ এবং একটি প্রজন্মের ধ্বংসসাধন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

পাঠ ৫.২: "লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও নারীর নিরাপত্তাহীনতা: ধর্ষণ ও গার্হস্থ্য নির্যাতনের আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান"

১. বাহ্যিক স্বাধীনতার আড়ালে এক অরক্ষিত সমাজ :

ক) আধুনিক পুঁজিবাদী ও উগ্র নারীবাদী বিভ্রম

পাশ্চাত্য আধুনিক সেক্যুলার সমাজ এবং উগ্র নারীবাদী প্রোপাগান্ডা বিশ্বজুড়ে এই ধারণার সস্তা প্রচার করে যে-অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, উন্মুক্ত জীবনধারা, অবাধ মেলামেশা এবং লিঙ্গহীন সমাজ নারীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও স্বস্তি দিয়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, নারী যখন নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং পুরুষের ঐতিহ্যগত অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে সমাজে একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ অবস্তানে পৌঁছায়।

কিন্তু সমকালীন বৈশ্বিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই চটকদার দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয়। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে তার সুরক্ষিত পারিবারিক দুর্গ থেকে বের করে এনেছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী লোলুপ মনস্তত্ত্বের সামনে তাকে একাকী, নিঃসঙ্গ এবং অরক্ষিত করে তুলেছে।

খ) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার চড়া মূল্য

পাশ্চাত্যে কঠোর আইনি কাঠামো, নিশ্ছিদ্র সিসিটিভি ক্যামেরা নজরদারি এবং অত্যন্ত উন্নত ও আধুনিক পুলিশি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার চরম অভাবের কারণে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। সেখানে নারীর অবাধ চলাচল তাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা দেয়নি; বরং নৈতিকতাবর্জিত সমাজে অপরাধীদের জন্য তাকে এক সহজ শিকারে পরিণত করেছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের সবচেয়ে বড় ভুল হলো, তারা অপরাধ দমনের জন্য কেবল বাহ্যিক আইন ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করেছে, কিন্তু মানুষের অন্তরের নৈতিক সংস্কার বা খোদাভীতি (তাকওয়া) তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, আজ ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত ও সভ্য দাবিদার দেশগুলোতে তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ও বস্তুগত উন্নতির সমান্তরালে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, ইভটিজিং ও গার্হস্থ্য নির্যাতনের এক ভয়াবহ মানবিক সুনামি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা পুরো সামাজিক কাঠামোকে ভেতর থেকে পচিয়ে দিচ্ছে।

গ) সুরক্ষাবলয় বনাম উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা

প্রকৃতিগতভাবেই নারী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনে কিছু মৌলিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ইসলাম এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নারীকে সমাজে এক বিশেষ সুরক্ষা ও অগ্রাধিকারমূলক মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদ এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নারীকে পুরুষের সাথে এক অসম ও রূঢ় কায়িক প্রতিযোগিতার ময়দানে নামিয়ে দিয়েছে।

যখন একজন নারী গভীর রাতে কর্মক্ষেত্র থেকে একাকী বাসায় ফেরেন বা জনশূন্য সাবওয়েতে যাতায়াত করেন, তখন আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ তাকে কোনো নিরাপত্তা দিতে পারে না। সুরক্ষার কোনো পারিবারিক বা সামাজিক দেওয়াল না থাকায়, তিনি প্রতিনিয়ত আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হন। ফলে বাহ্যিক স্বাধীনতার এই চাকচিক্যময় আবরণটি আসলে নারীর জন্য এক নতুন ধরণের শৃঙ্খল ও চরম অরক্ষিত জীবনের নামান্তর।

২. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ওয়েবসাইটের পরিসংখ্যান: এক পচনশীল সভ্যতার অকাট্য দলিল

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ডাটা ও ভয়াবহ বাস্তবতা

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক, সরকারি ডাটাবেজ এবং প্রথম সারির নিরপেক্ষ পশ্চিমা গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে পশ্চিমা সমাজে নারীর চরম নিরাপত্তাহীনতার চিত্রটি এক অকাট্য দলিল হিসেবে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের অধীনস্থ National Crime Victimization Survey (NCVS) এবং নারীদের সুরক্ষায় নিয়োজিত বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীন মার্কিন সংস্থা ও ওয়েবসাইট RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network)-এর অফিসিয়াল ও লাইভডাটা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে একজন নাগরিক সরাসরি যৌন নিপীড়নের শিকার হন।

প্রতি বছর সেখানে গড়ে ৪,৬০,০০০-এর বেশি মানুষ ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি ৬ জন মার্কিন নারীর মধ্যে ১ জন তাঁর জীবনে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক ধর্ষণের নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। সবচেয়ে আশঙ্কাজনক এবং সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে উদ্বেগজনক তথ্য হলো-এই অপরাধগুলোর ৭০ শতাংশেরই কোনো অপরিচিত অপরাধী নয়, বরং ভুক্তভোগী নারীর অত্যন্ত চেনা কোনো পুরুষ, বন্ধু, সহকর্মী বা কোনো লিভ-ইন পার্টনার। এই তথ্যটি প্রমাণ করে যে, আমেরিকার নিজস্ব ঘর ও পরিচিত পরিমণ্ডলও আজ তাদের নারীদের জন্য নিরাপদ নয়।

রেফারেন্স: মার্কিন বিচার বিভাগ (DOB) ও RAINN ডাটাবেজ (www.rainn.org)।

খ) ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার রিপোর্টের অন্ধকার দিক

একইভাবে আটলান্টিকের ওপারে ইউরোপের তথাকথিত সভ্য দেশগুলোর অবস্থাও সমান ভয়াবহ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার সংস্থা European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) কর্তৃক সমগ্র ইউরোপজুড়ে পরিচালিত এক বিশাল ও নিবিড় জরিপে দেখা গেছে, ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে ১৫ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে ১ জন (প্রায় ৩৩%) সরাসরি গুরুতর শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

যুক্তরাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (Office for National Statistics - ONS)-এর সাম্প্রতিক বার্ষিক তথ্যমতে, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮ লক্ষাধিক থেকে ২ মিলিয়নেরও বেশি নারী কোনো না কোনোভাবে গার্হস্থ্য নির্যাতনের (Domestic Abuse) মুখোমুখি হন। ইউরোপের সবচেয়ে প্রগতিশীল দাবিদার দেশ যেমন সুইডেন বা ডেনমার্কে মাথাপিছু ধর্ষণের হার সমগ্র বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ। এটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সেক্যুলার শিক্ষা বা বস্তুগত স্বাবলম্বিতা মানুষের ভেতরের পশুবৃত্তিকে দমন করতে পারে না, যদি না সেখানে ঐশী ধর্মীয় মূল্যবোধের শাসন থাকে।

রেফারেন্স: ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানবাধিকার সংস্থা (FRA) বার্ষিক রিপোর্ট।

গ) মিডিয়া ও কর্পোরেট সংস্কৃতিতে নারীর নজিরবিহীন পণ্যকরণ

বিশ্ববিখ্যাত ও প্রভাবশালী পশ্চিমা ম্যাগাজিন ও সাময়িকী যেমন The Economist, BBC, Time Magazine এবং UN Women-এর বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, পশ্চিমা পুঁজিবাদী মিডিয়া, বিনোদন জগৎ এবং মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি নারীকে একজন মানুষ বা বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে মূল্যায়নের পরিবর্তে কেবলই একটি 'যৌন বস্তু' বা ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

গাড়ি, সাবান, সফট ড্রিঙ্কস থেকে শুরু করে বড় বড় রাস্তার বিলবোর্ডে নারীর শরীর ও অবয়বকে পণ্য বিক্রির সস্তা ও সুরসুরিদায়ক হাতিয়ার করা হয়েছে। আধুনিক ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা একে পোশাকের ও শরীরের 'স্বাধীনতা' বলে প্রচার করলেও, আসলে এটি পুঁজিবাদীদের দ্বারা নারীর সবচেয়ে বড় অবমাননা। এই লাগামহীন প্রদর্শনীবাদ এবং যৌন সুড়সুড়ি সমাজের সাধারণ পুরুষদের মনস্তত্ত্বে অবদমিত কামলিপ্সাকে প্রতিনিয়ত উস্কে দেয়। যার চূড়ান্ত ও অবধারিত রূপ হিসেবে রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের ওপর পাশবিক যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে।
রেফারেন্স:যুক্তরাজ্য জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (ONS) ডাটা।

৩. লিভ-ইন রিলেশনশিপ এবং আইনি সুরক্ষাহীনতা

ক) বিয়ে প্রথার বিলুপ্তি ও চুক্তিহীন সহাবস্থানের ট্র্যাজেডি

আধুনিক পশ্চিমা সমাজে ঐতিহ্যবাহী ও পবিত্র বিয়ে প্রথা সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ার ফলে 'লিভ-ইন পার্টনারশিপ' বা কোনো ধর্মীয় ও আইনি চুক্তিহীন সহাবস্থান এখন সমাজের মূলধারার সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে। পশ্চিমা তরুণ-তরুণীদের একটি বিশাল অংশ বিয়েকে একটি অপ্রয়োজনীয় আইনি বোঝা মনে করে। সমকালীন সমাজবিজ্ঞানী ও পারিবারিক আইনজীবীদের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই ধরণের

চুক্তিহীন মুক্ত সম্পর্কগুলোর কোনো ধর্মীয় বা আইনি মজবুত ভিত্তি না থাকায় নারীরাই সবচেয়ে বেশি শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সহিংসতার শিকার হন।
ঐতিহ্যগত বিয়েতে যে সামাজিক স্বীকৃতি, দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি এবং পারিবারিক জবাবদিহিতা থাকে, লিভ-ইন সম্পর্কে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। ফলে এই সম্পর্কগুলো অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং সাময়িক আবেগের ওপর টিকে থাকে।

খ) দায়িত্বহীনতা ও একপাক্ষিক নির্যাতনের চালচিত্র

এই লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গী যেকোনো মুহূর্তে সামান্য অজুহাতে বা নতুন কোনো সঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে পারে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে। যেহেতু এটি কোনো বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, তাই সেখানে স্ত্রীর মতো নারীর কোনো আইনি অধিকার, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক সুরক্ষাকবচ (যেমন ইসলামের 'মহরানা' বা বিচ্ছেদের পর ভরণপোষণের আইনি বাধ্যবাধকতা) থাকে না। পুরুষটি কোনো প্রকার আইনি দায়বদ্ধতা ছাড়াই অনায়াসে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নারীটি রয়ে যান সমাজ ও জীবনের এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে।

ফলে পশ্চিমা নারীরা অর্থনৈতিকভাবে শতভাগ স্বাবলম্বী হওয়ার পরও এক গভীর মানসিক ট্রমা, তীব্র একাকীত্ব, বিষণ্ণতা এবং প্রতিনিয়ত পার্টনার হারানোর এক অবদমিত আতঙ্কের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। এই মানসিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও সুস্থ মাতৃত্বের সম্ভাবনাকে চিরতরে বিনষ্ট করে দেয়, যা পশ্চিমা ফেমিনিস্টরা কখনোই স্বীকার করতে চায় না।

গ) পরিবার ভাঙ্গনে সন্তানদের অপরাধপ্রবণতা

লিভ-ইন সম্পর্কের আরেকটি ভয়াবহ সামাজিক কুফল হলো-এই সম্পর্কগুলোর মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানরা কোনো স্থায়ী পিতৃপরিচয় বা পারিবারিক ভালোবাসা পায় না। বাবা-মায়ের ঘন ঘন পার্টনার পরিবর্তন এবং আকস্মিক বিচ্ছেদের কারণে এই শিশুরা চরম মানসিক বৈকল্য ও একাকীত্ব নিয়ে বড় হয়।

পাশ্চাত্যের অপরাধবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়েবসাইটের গবেষণা অনুযায়ী, ভাঙা পরিবার বা সিঙ্গেল মাদারদের কাছে বড় হওয়া সন্তানদের মধ্যেই মাদকাসক্তি, গ্যাং কালচার, চুরি, খুন এবং পরবর্তীতে নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ, পরিবার প্রথা ধ্বংস করে পশ্চিমা সমাজ সহিংসতার এমন এক আত্মঘাতী চক্র তৈরি করেছে, যা থেকে বের হওয়ার কোনো পথ তাদের জানা নেই।

রেফারেন্স: বিহাইন্ড ফেমিনিজম: নারীবাদের বাস্তবতা; পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৫৫।

৪. শারঈ সমাধান: 'হিজাব' ও 'নৈতিক প্রাচীর'

ক) হিজাব : অবরুদ্ধকরণ নয়, বরং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

পশ্চিমা সমাজ যেখানে নারীকে পণ্য বানিয়ে রাস্তায় নামিয়ে সহিংসতার মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে ইসলামী শরীয়ত নারীকে চার দেয়ালে বন্দি বা সমাজবিচ্ছিন্ন করার কথা বলে না। বরং বাইরে চলাচলের ক্ষেত্রে তার চারপাশে একটি অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী আইনি, সামাজিক ও নৈতিক সুরক্ষাবলয় তৈরি করে। এই ঐশী সুরক্ষাকবচের প্রধান হাতিয়ার হলো হিজাব ও শালীনতার বিধান। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় হিজাবের মূল হিকমত ও সামাজিক দর্শন তুলে ধরে ইরশাদ করেন:

يا أنها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত (নির্যাতন বা কষ্ট) করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –(সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯)

খ) বিশ্লেষণ: রত্নের সুরক্ষায় ইসলামের রাজকীয় আইন

এই সমাজ-পরিবর্তনকারী আয়াতের গভীর তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, হিজাব বা জিলবাবের এই অমোঘ বিধানের মূল উদ্দেশ্য নারীকে বন্দি বা ছোট করা নয়; বরং তাকে সমাজের লম্পট, বখাটে ও দুশ্চরিত্র পুরুষদের কুদৃষ্টি, উত্যক্তকরণ, ইভটিজিং ও সম্ভাব্য শারীরিক আক্রমণ থেকে এক নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা দেওয়া। 'জিলবাব' বা শালীন পোশাক পরিহিত একজন নারীকে সমাজ একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, পবিত্র ও মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে চেনে।
শালীনতার এই রাজকীয় পোশাকটি পুরুষের মনে এক ধরণের সমীহ ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে। ফলে কোনো দুশ্চরিত্র পুরুষ তাকে কোনো প্রকার কুপ্রস্তাব দেওয়ার বা তাঁর দিকে হাত বাড়ানোর সাহস পায় না। ইসলাম নারীকে প্রদর্শনীর সস্তা পণ্য হিসেবে নয়, বরং একটি 'মূল্যবান রাজকীয় রত্ন' হিসেবে মূল্যায়ন করে বলেই তার সুরক্ষার জন্য হিজাবের এই নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ব্যবস্থা করেছে, যা নারীকে ঘরের বাইরেও ঘরের মতোই নিরাপদ রাখে।

গ) মাহরাম ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক দায়িত্বশীলতা

হিজাবের পাশাপাশি ইসলাম নারীর দূরবর্তী ভ্রমণের ক্ষেত্রে 'মাহরাম' (যার সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম এমন বিশ্বস্ত পুরুষ অভিভাবক, যেমন পিতা, ভাই বা স্বামী) ব্যবস্থার বিধান জারি করেছে। এটি নারীর স্বাধীনতার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং এটি নারীর নিরাপত্তার জন্য পুরুষের ওপর চাপানো একটি আইনি বাধ্যবাধকতা।

৫. খিলাফতে রাশেদার বাস্তব নিরাপত্তা

ইসলামী সমাজব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্রীয় আইন ও মানুষের অন্তরের তাকওয়া কীভাবে নারীর শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তার এক অকাট্য ভবিষ্যৎবাণী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছিলেন। সাহাবী হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেছিলেন:

فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الجيزة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله "যদি তোমার জীবন দীর্ঘ হয়, তবে তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে-একজন একাকী নারী সওয়ারী (উটের পিঠে চড়ে) ইরাকের 'হীরা' নামক স্থান থেকে রওনা হয়ে সুদূর মক্কায় এসে কাবা শরীফ তাওয়াফ করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া তার মনে আর কোনো মানুষের ভয় থাকবে না।"
–(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব; হাদীস নং: ৩৫৯৫)

সীরাত ও তাত্ত্বিক সংশ্লেষ: সীরাত এবং খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্রীয় নথি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কোনো আধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা বা বিশাল পুলিশ বাহিনী ছাড়াই কেবল মানুষের অন্তরের খোদাভীতি এবং ইসলামের কঠোর ও দ্রুত বিচার ব্যবস্থার কারণে হাজার মাইল দীর্ঘ নির্জন মরুভূমি পাড়ি দিয়েও একজন নারী ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত। সমকালীন গবেষকদের মতে, পশ্চিমা বিশ্ব কোটি কোটি ডলার খরচ করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেও আজ তাদের বড় বড় শহরগুলোতে (যেমন নিউ ইয়র্ক বা লন্ডন) গভীর রাতে নারীদের এই স্তরের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।–(সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড: ৪)

পাঠ ৫.৩: "পাশ্চাত্য মডেল এবং নারীর দ্বিমুখী শোষণ: ক্যারিয়ারের নামে প্রতারণা ও পুঁজিবাদী দাসত্ব"

১. অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চটকদার স্লোগান ও পুঁজিবাদের লুকানো এজেন্ডা

আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মডেল এবং উগ্র নারীবাদী চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো নারীকে ঘর থেকে বের করে শ্রমবাজারে যুক্ত করা। তারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করে যে, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং পুরুষের সমান্তরাল ক্যারিয়ার গঠনই নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মমর্যাদার একমাত্র পথ। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম অর্থনীতি এবং সমাজবৈজ্ঞানিক গভীর পর্যালোচনা এই চটকদার স্লোগানের ভেতরের এক নির্মম ও নিষ্ঠুর সত্যকে উন্মোচন করে।

পাশ্চাত্যের এই অর্থনৈতিক মডেলটি মূলত নারীর প্রকৃত মুক্তির জন্য তৈরি হয়নি; বরং তা তৈরি হয়েছে পুঁজিবাদী স্বার্থে। শিল্প বিপ্লবের পর যখন পশ্চিমা পুঁজিপতিদের বিপুল পরিমাণ সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে, তখন তারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে নারীবাদের মাধ্যমে "নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা" নামক একটি কৃত্রিম ধারণাকে সমাজে ছড়িয়ে দেয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঘরে থাকা অর্ধেক মানবশক্তিকে কারখানায় এবং কর্পোরেট অফিসে নামিয়ে আনা, যাতে একদিকে সস্তা মজুরিতে কাজ করানো যায়, অন্যদিকে নারী যখন আয় করবে, তখন ভোগবাদী পণ্যের বাজারও দ্বিগুণ প্রসারিত হবে। এই অর্থনৈতিক কৌশলের ফাঁদে পড়ে আধুনিক নারী নিজের অজান্তেই এক নতুন ধরণের পুঁজিবাদী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২. ক্যারিয়ারের নামে প্রতারণা এবং "দ্বিমুখী শোষণ" -এর বাস্তব রূপ

পাশ্চাত্য সমাজ নারীকে ঘরের বাইরে এনে সফল ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম এবং তার জৈবিক বাধ্যবাধকতাকে সমাজ থেকে মুছে দিতে পারেনি। ফলে, আধুনিক কর্মজীবী নারী আজ এক চরম অমানবিক ও দ্বিমুখী শোষণের শিকার, যা সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় "সেকেন্ড শিফট" বা দ্বিমুখী শ্রমের বোঝা হিসেবে পরিচিত:

বাইরের জগতের কঠোর পেশাদারী চাপ: একজন নারীকে কর্পোরেট দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য পুরুষের সাথে সমান তালে এবং একই সময়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হচ্ছে। অফিসের টার্গেট, প্রজেক্ট ডেডলাইন, মানসিক চাপ এবং তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

গৃহের ভেতরের অন্তহীন মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব: অফিস থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরার পর কিন্তু নারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। উগ্র নারীবাদ পরিবার প্রথাকে দুর্বল করলেও সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা এবং ঘরের মৌলিক কাজগুলোকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি। ফলে একজন কর্মজীবী নারীকে ঘরে ফিরে আবার দ্বিতীয় শিফটে

কাজ শুরু করতে হয়-সন্তানের লালন-পালন, তাদের পড়াশোনা, রান্না-বান্না এবং সংসারের সমস্ত শৃঙ্খলা তাকে একাই সামলাতে হচ্ছে।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা পুরুষকে ঘরের কাজে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের কোনো আইনি কাঠামো দিতে পারেনি, কিন্তু নারীকে বাইরের উপার্জনে বাধ্য করেছে। এর ফলে, আধুনিক নারী আজ ঘরের রানী বা পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার সম্মান হারিয়ে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় কেবলই একজন খাটুনি খাটা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। ক্যারিয়ারের এই মোহময় প্রতারণা নারীর শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্বস্তি এবং মাতৃত্বের চিরন্তন গৌরবকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

৩. আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ডাটাবেজ

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং শ্রম সংস্থাগুলোর আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে পশ্চিমা অর্থব্যবস্থায় নারীর এই সুনিপুণ শোষণের এবং বৈষম্যের করুণ চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে:

লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization - ILO) এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (World Economic Forum)-এর বার্ষিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মতো উন্নত দেশগুলোতে এখনও একই পদে, একই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সমান সময় কাজ করার পরও নারীরা পুরুষদের চেয়ে গড়ে ১৬% থেকে ২০% কম মজুরি পান। একে অর্থনীতিতে এক ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য বলা হয়, যা প্রমাণ করে যে পুঁজিবাদ নারীকে মুখে সমানাধিকারের কথা বললেও কার্যত তাকে কম মূল্যের শ্রমিক হিসেবেই বিবেচনা করে।
রেফারেন্স: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বৈশ্বিক মজুরি প্রতিবেদন।বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) জেন্ডার গ্যাপ ডাটাবেজ।

গ্লাস সিলিং ইফেক্ট: বিখ্যাত মার্কিন বিজনেস ম্যাগাজিন Forbes এবং প্রথম সারির অর্থনৈতিক জার্নালগুলোর গবেষণা অনুযায়ী, ফরচুন ৫০০ (Fortune 500) কোম্পানির

মধ্যে শীর্ষ প্রধান নির্বাহী (CEO) পদগুলোতে নারীদের হার মাত্র ৮% থেকে ৯%। অর্থাৎ, কর্পোরেট জগতে নারীদেরকে নিচের স্তরের কঠোর পরিশ্রমি কাজে (যেমন রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, কাস্টমার কেয়ার বা ফ্যাক্টরি লেবার) ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলেও নীতিনির্ধারণী বা শীর্ষ নেতৃত্বের আসনে তাদের পৌঁছাতে দেওয়া হয় না। ক্যারিয়ারের এই অদৃশ্য দেয়ালকে সমাজবিজ্ঞানে 'গ্লাস সিলিং' বলা হয়।

মানসিক ট্রমা ও অবসাদ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর বৈশ্বিক মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পশ্চিমা দেশগুলোতে কর্মজীবী নারীদের মধ্যে তীব্র বিষণ্ণতা (Depression), প্যানিক অ্যাটাক এবং ক্রনিক ক্লান্তিজনিত সিন্ড্রোমের হার পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ। উপার্জনের পেছনে অন্ধ দৌড় এবং মাতৃত্বের দায়িত্ব একসাথে পালন করতে গিয়ে তাদের স্নায়বিক ও মানসিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ছে।
রেফারেন্স:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মানসিক স্বাস্থ্য রিপোর্ট।

৪.মাতৃত্বের অবমূল্যায়ন ও জনসংখ্যা হ্রাসের বৈশ্বিক সংকট: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ক. মাতৃত্বকে 'দাসত্ব' বানানোর উগ্র নারীবাদী মনস্তত্ব :

মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুস্থ মনস্তত্ত্বের সমাজ গঠনে 'মাতৃত্ব' (Motherhood) হলো প্রকৃতির সবচেয়ে নিখুঁত ও অলৌকিক উপহার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন উগ্র ও র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের উত্থান ঘটে, তখন তারা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক তাত্ত্বিক আক্রমণটি চালায় মাতৃত্বের ধারণার ওপর। পশ্চিমা নারীবাদী লেখিকা ও তাত্ত্বিকগণ (যেমন সিমন দ্য বোভোয়ার বা সুলামিথ ফায়ারস্টোন) তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে দাবি করতে শুরু করেন যে-মাতৃত্ব কোনো ঐশ্বরিক সম্মান বা গৌরব নয়; বরং এটি হলো নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় শিকল, একটি আদিম 'জৈবিক দাসত্ব' এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক নারীকে অবদমিত রাখার প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার।

তাঁদের প্রচারণা ছিল, প্রকৃতিগতভাবে সন্তান উৎপাদন এবং ঘরের ভেতর সন্তান লালন-পালনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে নারীরা বাইরে গিয়ে পুরুষদের সাথে সমান ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে না। অতএব, নারীকে যদি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও মুক্ত হতে হয়, তবে তাকে এই মাতৃত্বের 'বোঝা' এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে হবে। এই কৃত্রিম, বিকৃত ও উগ্র মনস্তত্ত্বটি যখন পশ্চিমা মূলধারার সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়, তখন তা নারী সমাজের মনস্তত্ত্বে এক ভয়ানক নেতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

পুঁজিবাদ এই ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডাকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে স্বাগত জানায়। কারণ পুঁজিপতিরা বুঝতে পেরেছিল, একজন নারী যতক্ষণ ঘরে থেকে মাতৃত্বের মমতায় একটি আদর্শ সন্তান ও পরিবার গঠনে সময় দেবেন, ততক্ষণ তিনি কোনো বহুজাতিক কোম্পানির জন্য বিলিয়ন ডলারের মুনাফা এনে দিতে পারবেন না। ফলে, সুকৌশলে কর্পোরেট সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি অলিখিত সামাজিক ধারণা তৈরি করা হয় যে- একজন সফল মা হওয়া বা ঘরে সন্তান মানুষ করার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য বা সামাজিক সম্মান নেই; বরং কর্পোরেট অফিসে একজন পুরুষ বসের অধীনে সামান্য বেতনে চাকরি করা এবং ক্যারিয়ারের অন্ধ প্রতিযোগিতায় নামাই হলো নারীর আধুনিকতা ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত মাপকাঠি।

এই চরম মনস্তাত্ত্বিক প্রতারণার ফাঁদে পড়ে আধুনিক পশ্চিমা নারীসমাজ মাতৃত্ববিমুখ হয়ে পড়েছে। তারা আজ সন্তান জন্মদানকে নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্য নষ্টের কারণ, ব্যক্তিগত উপভোগের পথে বাধা এবং পেশাগত ক্যারিয়ারের এক বিশাল অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। মাতৃত্বের এই সুনিপুণ অবমূল্যায়নের ফলে পরিবার থেকে মমতার বন্ধন আলগা হয়ে গেছে এবং নারী হারিয়েছেন তাঁর চিরন্তন আত্মিক প্রশান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা।

খ. জনসংখ্যা হ্রাসের বৈশ্বিক ট্র্যাজেডি ও আন্তর্জাতিক ডাটাবেজ (পরিসংখ্যান ও সমাজতাত্ত্বিক সংকট)

মাতৃত্বকে বোঝা মনে করার এবং সন্তানহীন জীবনধারা কে ফ্যাশন বানানোর এই আত্মঘাতী সংস্কৃতির ফলে আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব আজ এক ভয়াবহ ডেমোগ্রাফিক বা জনসংখ্যাগত গণবিস্ফোরণের মুখোমুখি হয়েছে। এটি আর কোনো তাত্ত্বিক বিতর্ক নয়; বরং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা, অর্থনৈতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক ও বৈশ্বিক ডাটাবেজের পরিসংখ্যানে প্রমাণিত এক নির্মম বাস্তব সংকট:

ফার্টিলিটি রেট বা প্রজনন হারের মহাবিপর্যয়: বিশ্ব ব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর জনসংখ্যা বিষয়ক বৈশ্বিক গবেষণা ও ডাটা অনুযায়ী, একটি দেশের জনসংখ্যাকে প্রাকৃতিকভাবে স্থিতিশীল রাখতে এবং একটি প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রতি নারীর গড় প্রজনন হার ন্যূনতম ২.১ হওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে আবশ্যিক। একে বলা হয় 'রিপ্লেসমেন্ট লেভেল ফার্টিলিটি' । কিন্তু আধুনিক নারীবাদী জীবনযাত্রার প্রভাবে বর্তমান সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং দূরপ্রাচ্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে (যেমন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া) এই প্রজনন হার ধসে পড়েছে। ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে (যেমন ইতালি, স্পেন ও জার্মানি) এই হার বর্তমানে মাত্র ১.২ থেকে ১.৪-এর মধ্যে ওঠানামা করছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই হার বিশ্ব ইতিহাসে সর্বনিম্ন ০.৭২-এ নেমে এসেছে। এর সহজ ও ভয়ানক অর্থ হলো- এই দেশগুলোতে নতুন শিশুর জন্ম হচ্ছে না বললেই চলে, যার ফলে প্রাকৃতিক উপায়েই পুরো মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
রেফারেন্স:বিশ্ব ব্যাংক বৈশ্বিক জনসংখ্যা ও প্রজনন হার সূচক ডাটাবেজ।
এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বৈশ্বিক জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন।

The Economist, BBC ও বৈশ্বিক গণমাধ্যমের তীব্র উদ্বেগ: বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাময়িকী The Economist এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম BBC-এর বিভিন্ন গভীর সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধে এই সংকটকে একটি 'ডেমোগ্রাফিক টাইম বোম্ব' বা জনসংখ্যাগত গণবিস্ফোরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সন্তান না

নেওয়ার এবং পরিবার গঠন না করার এই সংস্কৃতির ফলে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে এক চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মুখে পড়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুফল: নতুন প্রজন্ম বা তরুণ যুবসমাজের অভাবের কারণে এই দেশগুলোতে কর্মক্ষম জনশক্তি ও করদাতার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রবীণ বা বয়োবৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে, যাদের স্বাস্থ্যসেবা ও পেনশনের বিশাল ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি পঙ্গু হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যুবসমাজের অভাবে এই সভ্যতাগুলো অদূর ভবিষ্যতে বহিরাগত অভিবাসীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জাতিগত অস্তিত্ব চিরতরে হারিয়ে যাবে।

রেফারেন্স: বিখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী The Economist (ডেমোগ্রাফিক সংকট ও বৈশ্বিক অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা)। এবং বিবিসি নিউজ (BBC World) ডেমোগ্রাফিক টাইম বোম্ব ও সামাজিক পতন সংক্রান্ত বিশেষ রিপোর্ট।

প্রণোদনার ব্যর্থতা ও প্রতারণার উন্মোচন: বর্তমানে ইউরোপের অনেক দেশ (যেমন হাঙ্গেরি, ইতালি ও ফ্রান্স) নারীদেরকে পুনরায় মাতৃত্বের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সন্তান জন্মদানের হার বাড়াতে প্রতি সন্তানের জন্য হাজার হাজার ডলারের নগদ আর্থিক প্রণোদনা, দীর্ঘমেয়াদী মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর মওকুফের মতো রাষ্ট্রীয় আইন জারি করেছে। কিন্তু উগ্র নারীবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গত কয়েক দশকে পশ্চিমা নারীর মনস্তত্ত্বকে এতটাই বিষাক্ত ও ক্যারিয়ার সর্বস্ব করে তুলেছে যে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক লোভ দেখিয়েও রাষ্ট্রগুলো নারীদেরকে পুনরায় পরিবার গঠন ও মাতৃত্বের পবিত্র ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। এটিই প্রমাণ করে যে, পশ্চিমা নারীবাদের তথাকথিত 'অধিকার' ও 'মুক্তি'র দর্শনটি মূলত মানব সভ্যতাকে এক আত্মহনন ও চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

৫. ইসলামী নফকা- نَفَقَة (ভরণপোষণ) আইনের অভেদ্য অর্থনৈতিক সুরক্ষাকবচ

পাশ্চাত্যের এই শোষণের বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা নারীকে এক অনন্য, নিশ্ছিদ্র এবং অজেয় অর্থনৈতিক সুরক্ষাকবচ ও আইনি স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। ইসলাম নারীকে উপার্জনের বা সম্পদ অর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের কোনো

বাধ্যতামূলক দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেনি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্বের এই নিখুঁত ভারসাম্য ঘোষণা করে ইরশাদ করেন:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبما أنفقوا من أموالهم
"পুরুষেরা নারীদের ওপর অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী; কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব (শারীরিক ও দায়িত্বগত বিশেষত্ব) দিয়েছেন এবং এ কারণে যে, পুরুষেরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) ব্যয় করে।"
–(সূরা আন-নিসা,৪: ৩৪)

তাফসীর: এই আয়াতের অধীনে মুফাসসিরগণ অভিভাবক/পরিচালনাকারী শব্দের আইনি ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী, বিয়ের পর একজন স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং সমস্ত প্রকার জীবনযাত্রার ব্যয়ভার (যাকে পরিভাষায় 'নফকা' বলা হয়) একক ও বাধ্যতামূলকভাবে স্বামীর ওপর ন্যস্ত। স্ত্রী যদি কোটিপতিও হন, তবুও স্বামী তাঁর সম্পদ থেকে নিজের জন্য বা সংসারের জন্য এক পয়সাও জোরপূর্বক দাবি করতে পারবেন না। নারীর সমস্ত উপার্জিত অর্থ বা মিরাসের সম্পত্তি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সঞ্চয়।

ইসলামের এই অর্থনৈতিক দর্শনের মূল সৌন্দর্য হলো-এটি নারীকে জীবিকার কঠিন ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে। নারীকে বেঁচে থাকার জন্য বা নিজের সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য সমাজ বা কোনো কর্পোরেট মালিকের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয় না। তিনি যদি চাকরি বা ব্যবসা করতে চান, তা করেন সম্পূর্ণ নিজের মেধার বিকাশ এবং সমাজসেবার উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক ও স্বাধীনভাবে, পুজিবাদী দাসত্বের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নয়।

৬.সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: মাতৃত্বের মহান মূল্যায়ন ও পারিবারিক স্বস্তি

সীরাতে ইবনে হিশাম এবং হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রমাণ করে যে, প্রাথমিক ইসলামী সমাজে নারীরা ঘরের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও মাতৃত্বের সুরক্ষাকেই তাঁদের জীবনের

সবচেয়ে বড় স্বস্তি ও গৌরব মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজ গঠনে মায়ের ভূমিকাকে রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়েও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

মাতৃত্বের জান্নাতী মর্যাদা: এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা কি জীবিত আছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, জীবিত আছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐতিহাসিক নির্দেশটি প্রদান করে বললেন: "তুমি তোমার মায়ের খেদমতে লেগে থাকো, কেননা তাঁর দুই পায়ের নিচেই রয়েছে জান্নাত।"

–(সুনান নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ; হাদীস নং: ৩১০৪ সহীহ সনদ)

পারিবারিক শ্রম বিভাজনের সীরাত: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) এবং জামাতা হযরত আলী (রা.)-এর বিয়ের পর তাঁদের পারিবারিক দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তিনি ঘরের ভেতরের সমস্ত কাজ (যেমন আটা পেষা, পানি আনা, ঘর গোছানো ও সন্তান লালন-পালন) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ওপর এবং ঘরের বাইরের সমস্ত অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব হযরত আলী (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন।–(সীরাতে ইবনে হিশাম)

এই নিখুঁত ও প্রাকৃতিক শ্রম বিভাজনের কারণে ইসলামী পরিবারগুলোতে কোনো প্রকার পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ক্ষোভ জন্ম নিত না; বরং ঘরে বিরাজ করত রহমত ও প্রশান্তি। পশ্চিমা বিশ্ব এই পারিবারিক স্বস্তিকে ধ্বংস করে নারীকে জোরপূর্বক অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে আজ তাকে এক সীমাহীন মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি করেছে।

পাঠ ৫.৪: "লিঙ্গীয় সংঘাত : নারী ও পুরুষকে প্রতিপক্ষ বানানোর সামাজিক কুফল"

১. লিঙ্গীয় সংঘাতের উৎপত্তি এবং নারীবাদের উগ্র মনস্তত্ত্ব

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এসেছে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়া, আস্থা, গভীর ভালোবাসা এবং পরিপূরকতার

ওপর। কিন্তু আধুনিক উগ্র নারীবাদী দর্শন এই চিরায়ত বন্ধনের মূলে এক চরম বিষাক্ত ও ধ্বংসাত্মক ধারণার জন্ম দিয়েছে, যাকে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'লিঙ্গীয় সংঘাত' বা 'জেন্ডার কনফ্লিক্ট' বলা হয়। মার্ক্সবাদী শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে জেন্ডার বা লিঙ্গের ওপর প্রক্ষেপণ করে এই মতবাদে দাবি করা হয় যে-মানব সমাজ মূলত একটি যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে পুরুষ হলো চিরকালের শোষক বা উৎপীড়ক শ্রেণী এবং নারী হলো ঐতিহ্যগতভাবে শোষিত বা নির্যাতিত শ্রেণী। উগ্র নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে পরিবার , বিবাহ ব্যবস্থা, দাম্পত্য জীবন এবং মাতৃত্বকে পুরুষের তৈরি এক ধরণের আইনি ও সামাজিক ফাঁদ হিসেবে অপপ্রচার শুরু করেন।

এই চরমপন্থী ও কৃত্রিম দর্শনের কুফল হিসেবে, আধুনিক সমাজে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের বন্ধু, মানসিক সহযোগী, আত্মার আত্মীয় বা পরিপূরক জীবনসঙ্গী হিসেবে দেখার মনস্তত্ত্বটি সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর বিপরীতে, তাঁদের দুজনকে চিরস্থায়ী 'প্রতিপক্ষ' বা শত্রু হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নারীবাদ আধুনিক নারীদের মনে অবচেতনে এই ধারণা গভীরভাবে গেঁথে দিয়েছে যে, পুরুষের প্রতি যেকোনো ধরণের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আনুগত্য বা নমনীয়তা প্রদর্শন করা মানেই হলো নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার বিসর্জন দেওয়া এবং পুরুষতান্ত্রিক দাসত্ব মেনে নেওয়া। এই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের ফলে আধুনিক পশ্চিমা ধাঁচের সমাজগুলোতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসের দেয়াল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এর চূড়ান্ত ফলশ্রুতিতে, সাধারণ মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এক গভীর অবিশ্বাস, চিরস্থায়ী সন্দেহ এবং ঘরে-বাইরে সব জায়গায় এক সর্বগ্রাসী লিঙ্গীয় সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে, যা পুরো সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

২. লিঙ্গীয় সংঘাতের সামাজিক কুফল ও বৈশ্বিক ডেমোগ্রাফিক সংকট

নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ বানানোর এবং বৈবাহিক জীবনকে একটি আইনি যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দাঁড় করানোর এই আত্মঘাতী সংস্কৃতির ফলে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় যে মারাত্মক ফাটল ও কুফল দেখা দিয়েছে, তা সমকালীন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ডাটাবেজে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে:

বিবাহের প্রতি চরম অনাগ্রহ ও একক সমাজ (Solo Society): লিঙ্গীয় সংঘাতের সবচেয়ে বড় সামাজিক কুফল হলো প্রথাগত পবিত্র বিবাহ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধস। বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) এবং ইউরোপীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (Eurostat)-এর সাম্প্রতিক ডাটা অনুযায়ী, পশ্চিমা দেশগুলোতে গত দুই দশকে বিয়ের হার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পুরুষেরা পশ্চিমা ফেমিসিড ও ডিভোর্স আইনের অতিরিক্ত একপেশে কড়াকড়ির কারণে এবং মিথ্যা হয়রানির আশঙ্কায় বিয়ে করতে চরম আতঙ্ক বোধ করছে। অন্যদিকে, নারীরা বিয়েকে তাঁদের ক্যারিয়ার ও স্বাধীনতার অন্তরায় মনে করছেন। এর ফলে পাশ্চাত্যে 'একক সমাজ' বা একাকী জীবনযাপনের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে, যা মানুষের চিরন্তন মানসিক ও সামাজিক চাহিদাকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

রেফারেন্স: বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) বৈশ্বিক বিবাহ ও সামাজিক রূপান্তর সূচক ডাটাবেজ।ইউরোপীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (Eurostat) বার্ষিক সামাজিক প্রতিবেদন।

বিচ্ছেদের মহামারী ও ভাঙা পরিবার: যেখানে বিয়ে হচ্ছে, সেখানেও পারস্পরিক ছাড় ও সহনশীলতার অভাবের কারণে তুচ্ছ ঘটনায় ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ ঘটছে। আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক জার্নালগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পশ্চিমা বিশ্বে প্রায় ৫০% বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদে রূপ নেয়। এর সরাসরি কুফল ভোগ করছে পরবর্তী প্রজন্ম। বাবা-মায়ের এই লিঙ্গীয় সংঘাতের মাঝে বড় হওয়া শিশুরা তীব্র মানসিক হীনম্মন্যতা, বিষণ্ণতা এবং অপরাধপ্রবণতায় ভুগছে, যা পুরো সামাজিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

পুরুষ ও নারীর মানসিক দূরত্ব ও সামাজিক রোবটকরণ: বিখ্যাত মার্কিন সাময়িকী Psychology Today-এর এক সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীবাদী আইনের অতিরিক্ত কড়াকড়ির কারণে পুরুষ ও নারীদের মাঝে এক ধরণের অদৃশ্য মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল তৈরি হয়েছে। পুরুষ সহকর্মীরা নারীদের সাথে স্বাভাবিক পেশাদারী মেলামেশা বা কোনো বিপদে সাহায্য করতেও ভয় পায়, পাছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো হয়রানি বা ইভটিজিংয়ের ভুল অভিযোগ আনা হয়। এই পারস্পরিক দূরত্ব ও সন্দেহ সমাজকে যান্ত্রিক, রোবটতুল্য এবং অনুভূতিহীন করে তুলছে, যেখানে মানবিক ভালোবাসার কোনো স্থান নেই।

রেফারেন্স: বিখ্যাত মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক সাময়িকী Psychology Today (জেন্ডার কনফ্লিক্ট বিষয়ক প্রবন্ধ)।

৩. পারস্পরিক পরিপূরকতা ও ইনসাফের কুরআনী দর্শন

পাশ্চাত্যের এই ধ্বংসাত্মক লিঙ্গীয় সংঘাতের বিপরীতে ইসলামী শরীয়াহ নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে কোনো যুদ্ধক্ষেত্র বা প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখে না; বরং একে মানবীয় ভারসাম্য ও ঐশী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, নারী ও পুরুষ কেউ কারো শত্রু বা প্রতিপক্ষ নয়, বরং তারা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও পরিপূরক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই শাশ্বত দর্শন ঘোষণা করে ইরশাদ করেন:

وَا لْمُؤْمِنُوْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“মু’মিন পুরুষ আর মু’মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে” –(সূরা আত-তাওবাহ ৯: ৭১)

একটি সুস্থ ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে নারী ও পুরুষ একে অপরের হাত ধরে কাজ করবে। কেউ কাউকে ছোট বা শোষক ভাববে না। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে" (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن এবং তোমরা তাদের পোশাক"-সূরা বাকারা: ১৮৭) পোশাক যেভাবে মানুষের শরীরের ত্রুটি ঢেকে রাখে, তাকে শীত-গরম থেকে সুরক্ষা দেয় এবং তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ঠিক তেমনি ইসলামী সমাজে নারী ও পুরুষ পরস্পরের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করে একে অপরকে সামাজিক ও মানসিক সুরক্ষা প্রদান করে। ইসলাম অধিকারের নামে সংঘাত নয়, বরং মর্যাদার ভিত্তিতে এক নিখুঁত ইনসাফ ও শান্তির সমাজ কায়েম করে।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির বাস্তব রূপ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার পবিত্র সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো প্রকার লিঙ্গীয় সংঘাত বা প্রতিপক্ষ ভাবার মানসিকতা ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি: বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে, যেখানে মানবজাতির সমস্ত অধিকারের সনদ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে আল্লাহর রাসূল (সা.) পুরুষ সমাজকে নারীদের প্রতিপক্ষ না ভেবে তাদের প্রতি সদয় ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন: "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।" –(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ; হাদীস নং: ১২১৮)।

পারিবারিক সম্প্রীতি : সীরাতের ইতিহাসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন, তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক মেধাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করতেন। সাহাবীগণও তাঁদের স্ত্রীদের দ্বীনের অর্ধেক ও ঘরের রানী হিসেবে মূল্যায়ন করতেন।

ইসলামের এই স্বর্ণালী পারিবারিক ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ নিজ নিজ শারঈ দায়িত্ব ও সীমানা আনন্দের সাথে মেনে চলতেন, যার ফলে সেখানে কোনো অধিকার আদায়ের হিংসাত্মক লড়াই বা লিঙ্গীয় সংঘাতের জন্ম নেয়নি। পশ্চিমা বিশ্ব নারীবাদের মাধ্যমে এই প্রাকৃতিক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করে আজ পুরো মানব সমাজকে এক গভীর কুফল ও অশান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

পাঠ ৫.৫: "নারীর নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক ট্রমা ও ডিপ্রেশনের করাল গ্রাস"

১. আধুনিক সভ্যতার মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও চটকদার স্বাধীনতার অসারতা

আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতি নারীকে যে পরম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি আজ এক চরম মানসিক বিপর্যয় ও নৈতিক শূন্যতায় রূপ নিয়েছে। বাহ্যিকভাবে আধুনিক প্রযুক্তি, বস্তুগত প্রাচুর্য এবং যথেচ্ছ জীবনযাপনের সুযোগ থাকলেও পশ্চিমা নারীসমাজ আজ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মুখোমুখি। উগ্র নারীবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে মানুষের আত্মিক ও নৈতিক চাহিদাকে

সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কেবলই ইন্দ্রিয়সুখ ও বস্তুগত সাফল্যকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই লক্ষ্যহীন ও লাগামহীন জীবনধারা নারীকে সাময়িক উত্তেজনা দিলেও তার ভেতর এক গভীর একাকীত্ব এবং অস্তিত্বের সংকট (Existential Crisis) তৈরি করেছে। ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধনের অনুপস্থিতি, বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গীর অভাব এবং প্রতিনিয়ত সমাজ ও কর্পোরেট বিশ্বের পক্ষ থেকে নিজের শরীরের অবয়ব ও বয়স ধরে রাখার যে অলিখিত সামাজিক চাপ রয়েছে, তা পশ্চিমা নারীর মনস্তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে। ফলে বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে আজ পাশ্চাত্যের নারীরা বিষণ্ণতা (Depression) ও তীব্র মানসিক ট্রমার এক অন্ধকার গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত।

২. আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থা ও ওয়েবসাইটের ভয়াবহ পরিসংখ্যান

পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয় এবং এর ফলে সৃষ্ট মানসিক মহামারীর প্রকৃত রূপ সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক গবেষণা সংস্থার পরিসংখ্যানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে:

যুক্তরাষ্ট্রে ডিপ্রেশনের মহামারী: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা Centers for Disease Control and Prevention (CDC) এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক শীর্ষ প্রতিষ্ঠান National Institute of Mental Health (NIMH)-এর অফিশিয়াল ডাটা অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে তীব্র বিষণ্ণতা (Major Depressive Disorder) এবং দুশ্চিন্তাজনিত রোগে (Anxiety Disorders) আক্রান্ত হওয়ার হার প্রায় দ্বিগুণ। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ৫ জন মার্কিন নারীর মধ্যে ১ জন তাঁর জীবনে কোনো না কোনো সময় তীব্র ডিপ্রেশনের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং নিয়মিত অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট (Antidepressant) বা মানসিক অবসাদ দূর করার ওষুধ সেবন করেন।
রেফারেন্স:মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা (CDC) ও NIMH বার্ষিক রিপোর্ট।

অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্টের ওপর ভয়াবহ নির্ভরতা: বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল The Lancet এবং Harvard Medical School-এর প্রকাশিত স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত দুই দশকে পশ্চিমা দেশগুলোতে (বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে) নারীদের মাঝে মানসিক রোগের ওষুধ সেবনের হার জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী কর্মজীবী নারীদের একটি বিশাল অংশ প্রতিদিন সকালে কৃত্রিম হরমোন বা ট্যাবলেটের ওপর নির্ভর করে তাঁদের মানসিক সুস্থতা ধরে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন, যা তাঁদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সক্ষমতাকে ধ্বংস করছে।

মাদকাসক্তি ও আত্মহত্যার প্রবণতা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর বৈশ্বিক ডাটাবেজ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, পশ্চিমা তরুণী ও মধ্যবয়সী নারীদের মধ্যে একাকীত্ব এবং সম্পর্কের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে মাদক, অ্যালকোহল এবং ঘুমের ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। তীব্র মানসিক ট্রমা সহ্য করতে না পেরে প্রতি বছর হাজার হাজার পশ্চিমা নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন Psychology Today-এর এক সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিবারহীন ও লক্ষ্যহীন জীবনই এই আত্মঘাতী মানসিকতার মূল উৎস।

৩. নৈতিক অবক্ষয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনের বিলুপ্তি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো নৈতিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শিক্ষা দেয় যে, মানুষের নৈতিকতা বা শালীনতা বলে চিরন্তন কিছু নেই, সবকিছুই আপেক্ষিক। এই দর্শনের কারণে সমাজে লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতার ধারণাকে পরাধীনতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

যখন একটি সমাজ থেকে হিজাব, শালীনতা এবং নৈতিক প্রাচীর সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়, তখন সমাজটি এক অবাধ যৌন অরাজকতার চারণভূমিতে পরিণত হয়। কিশোরী বয়স থেকেই অবাধ্যতা, মাদক এবং অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতির কারণে নারীরা খুব অল্প বয়সেই তাঁদের মানসিক পবিত্রতা ও আবেগের স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলেন।

বিশ্বস্ততার অভাব এবং ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের কারণে তাঁরা কাউকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে পারেন না, যা তাঁদের চিরস্থায়ী মানসিক ট্রমা ও অতৃপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।

৪. ক্বলব বা অন্তরে শান্তির ঐশী দর্শন

পাশ্চাত্যের এই মানসিক মহামারীর বিপরীতে ইসলাম মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক সুস্থতার এক নিখুঁত ও শাশ্বত সমাধান পেশ করেছে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, মানুষের মন কেবল বস্তুগত প্রাচুর্য বা কৃত্রিম স্বাধীনতায় শান্তি পায় না; বরং মনের প্রকৃত শান্তি নিহিত রয়েছে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে আত্মিক সম্পর্কের মাঝে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

الذين آمنوا وتظمين قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

"যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই কেবল অন্তরসমূহ প্রশান্ত ও স্থির হয়।"
–(সূরা আর-রা'দ, ১৩: ২৮)

তাফসীর: এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের 'কালব' বা অন্তরের গঠন এমনভাবে করা হয়েছে যে, তা যতক্ষণ না আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া এবং নৈতিক পবিত্রতার চাদরে আবৃত থাকবে, ততক্ষণ তা এক অপূর্ণতা ও অশান্তিতে ভুগবে। পশ্চিমা নারী সব ধরণের বাহ্যিক ভোগবিলাসের উপকরণ পাওয়ার পরও কেন ডিপ্রেশনে ভোগে-তার মূল কারণ এই আয়াতে স্পষ্ট। তারা আল্লাহর দেওয়া হিজাব, শালীনতা এবং পারিবারিক পবিত্রতার বিধানকে ত্যাগ করে আত্মার চিরন্তন খোরাক থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে। ইসলাম নারীকে লজ্জাশীলতা ও ইবাদতের মাধ্যমে যে আত্মিক স্থিরতা ও মানসিক স্বস্তি দান করে, পৃথিবীর কোনো আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি বা অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ তা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

৫. সীরাত ও হাদীসের আলো: তাকওয়া ও লজ্জাশীলতার সুরক্ষাকবচ

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর লজ্জাশীলতাকে কোনো দুর্বলতা নয়, বরং তার সবচেয়ে বড় মানসিক শক্তি ও সুরক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن

الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

"ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জাশীলতা (হায়া) হলো ঈমানের একটি বিশেষ ও অবিচ্ছেদ্য শাখা।"
–(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান; হাদীস নং: ৯)

সীরাতে ইবনে হিশামের বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, মদীনার পবিত্র সমাজে নারী সাহাবীগণের সবচেয়ে বড় অলঙ্কার ছিল তাঁদের 'হায়া' বা লজ্জাশীলতা। এই লজ্জাশীলতা তাঁদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, বরং তাঁদের মনস্তত্ত্বকে এক ধরণের অনন্য আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদা দিয়েছিল। তারা জানতেন যে তাঁরা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত দামী এবং সমাজে তাঁদের একটি সুনির্দিষ্ট, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নারীর মন থেকে এই লজ্জাশীলতার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তাকে এক চরম মানসিক হীনম্মন্যতায় ভুগিয়েছে, যেখানে তাকে প্রতিনিয়ত নিজের শরীর প্রদর্শন করে সমাজে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম তাকওয়া ও হায়ার সুরক্ষাকবচ দিয়ে নারীকে মানসিক অবসাদ ও ডিপ্রেশন থেকে মুক্ত করে এক পরম আত্মিক শান্তি ও গৌরবময় জীবন নিশ্চিত করেছে।

পাঠ ৫.৬: "নারীর নিঃসঙ্গতা ও ওল্ড হোম সংস্কৃতি: নারীবাদের তথাকথিত 'মুক্তির' চূড়ান্ত পরিণতি"

১. নারী স্বাধীনতার মোহময় স্লোগান এবং এর পিছনের ভয়াবহতা :

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ দর্শনের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ! উগ্র নারীবাদী আন্দোলন এই দর্শনকে পুঁজি করে নারীদের মনে এক কৃত্রিম ধারণার জন্ম দিয়েছে। তারা চিরাচরিত পরিবার প্রথা, দাম্পত্য জীবন এবং মাতৃত্বের পবিত্র পারিবারিক দায়িত্বকে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে সবচেয়ে বড় 'শৃঙ্খল' এবং পুরুষতান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে প্রচার করেছে। নারীবাদের মূল স্লোগানই ছিল-নারীকে যদি প্রকৃত মুক্তি ও আত্মমর্যাদা অর্জন করতে হয়, তবে তাকে পুরুষ বা পরিবারের ওপর কোনো প্রকার নির্ভরতা না রেখে সম্পূর্ণ একা, স্বাধীন এবং নিজের ক্যারিয়ারের জন্য বাঁচতে শিখতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিধানকে অস্বীকার করে তৈরি করা এই মোহময় স্লোগানের আড়ালে যে কত বড় নিষ্ঠুর ফাঁদ লুকিয়ে ছিল, তা গত কয়েক দশকের পশ্চিমা বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপট স্পষ্টভাবে উন্মোচন করে দিয়েছে।

যৌবনের প্রারম্ভে এই তথাকথিত স্বাধীনতার মোহে পড়ে যে নারীরা পারিবারিক বন্ধনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের চিরন্তন দায়িত্বকে অবহেলা করেছিলেন, ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছানোর পর তাঁরা এক চরম ও অমানবিক শূন্যতার মুখোমুখি হচ্ছেন। পুঁজিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মানুষের অবয়ব ও উপযোগিতাকে কেবল তার অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা দিয়ে পরিমাপ করে। একজন নারী যতক্ষণ তরুণী থাকেন, যতক্ষণ তাঁর শ্রম দেওয়ার এবং কর্পোরেট মুনাফা বাড়ানোর শারীরিক সক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ পুঁজিবাদ তাকে 'স্বাধীনতার' স্তুতি গেয়ে মাথায় তুলে রাখে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন তাঁর সেই কায়িক সক্ষমতা ও বাহ্যিক জৌলুস ফুরিয়ে যায়, তখন সমাজ তাকে একপাশে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এর ফলে, জীবনের শেষভাগে এসে এই নারীরা এক ভয়াবহ, নিরেট ও নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতার করাল গ্রাসে পতিত হন। পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে কোনো পারিবারিক যৌথ কাঠামো বা সন্তানের আন্তরিক দায়িত্ববোধ না থাকায়, প্রবীণ নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। যৌবনের সেই চাকচিক্যময় কর্পোরেট ব্যস্ততা এবং কৃত্রিম বন্ধুদের কোলাহল শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের জীবন এক অভিশপ্ত নীরবতায় নিমজ্জিত হয়, যা তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক ট্র্যাজেডিতে রূপ নেয়।

২. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব চিত্র

নারীবাদের তথাকথিত 'মুক্তি'র এই চূড়ান্ত ও পচনশীল পরিণতি আজ আর কেবল কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক বিতর্ক নয়; বরং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং উন্নত দেশগুলোর সরকারি ডাটাবেজের পরিসংখ্যানে প্রমাণিত এক ভয়াবহ বৈশ্বিক মানবিক সংকট:

একাকীত্বের বৈশ্বিক মহামারী : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান চিকিৎসকের কার্যালয় (Office of the Surgeon General)-এর আনুষ্ঠানিক বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বে একাকীত্বকে একটি 'মারাত্মক জনস্বাস্থ্য মহামারী' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এই দীর্ঘমেয়াদী একাকীত্ব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন **১৫**টি সিগারেট খাওয়ার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। ডেমোগ্রাফিক পরিসংখ্যান বলছে, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ নারীদের প্রায় ৪০% থেকে ৪৫% সম্পূর্ণ একাকী একটি ফ্ল্যাটে বা ঘরে জীবনযাপন করেন। তাঁদের সপ্তাহে বা মাসে একটিবার মুখে কথা বলার মতো বা তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার মতো কোনো আপনজন, সন্তান বা আত্মীয় থাকে না।

ওল্ড হোম সংস্কৃতির নির্মম ও অমানবিক রূপ: পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় বিয়ে প্রথা ও পারিবারিক দায়িত্ববোধ ধসে যাওয়ার কারণে 'ওল্ড হোম' বা 'নার্সিং হোম' সংস্কৃতি চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের জার্নালগুলোর দীর্ঘমেয়াদী ডাটা অনুযায়ী,,

কোটি কোটি প্রবীণ নারী তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন এই বৃদ্ধাশ্রমগুলোর চার দেয়ালের মাঝে। পরিবার ও সন্তানের স্নেহ-মমতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই ওল্ড হোমগুলোতে নারীরা চরম মানসিক হীনম্মন্যতা, অবহেলা ও বিষণ্ণতার শিকার হন। অনেক সময় এই ওল্ড হোমের কামরাগুলোতে কোনো প্রবীণ নারী মারা যাওয়ার পরও কয়েকদিন পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না, যা আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে নগ্ন ও নির্মম ট্র্যাজেডি। বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল The Lancet-এর একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে,বার্ধক্যে পৌঁছানো নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার এবং একাকীত্বজনিত কারণে পশ্চিমা প্রবীণ নারীদের মধ্যে স্মৃতিভ্রম, আলঝেইমার্স এবং তীব্র বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার পুরুষদের তুলনায় আশঙ্কাজনকভাবে বেশি।

বিলাসবহুল নিঃসঙ্গতা এবং পারিবারিক শূন্যতা: আধুনিক পশ্চিমা সমাজে অনেক প্রবীণ নারী ক্যারিয়ারের কারণে অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত ধনী বা বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কেবল একটি আন্তরিক ও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে এক চরম হাহাকারে ভোগেন। বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন Psychology Today-এর এক সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, এইনিঃসঙ্গতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে এবং নিজেদের অবদমিত মাতৃত্বের স্নেহ প্রকাশের জন্য বহু পশ্চিমা প্রবীণ নারী বিড়াল বা কুকুরের মতো পোষা প্রাণীকে নিজেদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও সম্পদ মানুষের পরিবর্তে এই পোষা প্রাণীদের নামে উইল বা দান করে দিয়ে মারা যাচ্ছেন। এটিই প্রমাণ করে যে, বস্তুগত প্রাচুর্য ও উগ্র নারীবাদের দেওয়া যথেচ্ছ স্বাধীনতা মানুষের অন্তরের পারিবারিক ও আত্মিক ভালোবাসার শূন্যতাকে কখনোই পূরণ করতে পারে না; বরং জীবনের শেষ দিনগুলোকে এক গভীর ও করুণ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

৩. ইসলামে বার্ধক্যে নারীর রাজকীয় মর্যাদা

পাশ্চাত্যের এই অমানবিক ও পচনশীল বার্ধক্য সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতে ইসলামী শরীয়াহ বৃদ্ধ বয়সে মাতৃত্বকে এবং প্রবীণ নারীদের মর্যাদা ও অধিকারকে সমাজের সর্বোচ্চ এবং পবিত্রতম আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম পরিবার প্রথাকে এমনভাবে

বিন্যস্ত করেছে যেখানে একজন নারী যত বৃদ্ধ হন, পরিবার ও সমাজে তাঁর সম্মান ও অধিকার তত বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বার্ধক্যে পিতা-মাতা, বিশেষ করে মায়ের প্রতি সদাচরণের আইনি ও ধর্মীয় নির্দেশ জারি করে ইরশাদ করেছেন:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل

لهما أف ولا تنهرهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদের উফ! (বিরক্তিপ্রকাশক শব্দ) বলো না এবং তাঁদের ধমক দিও না; বরং তাঁদের সাথে সম্মানসূচক ও নরম কথা বলো।" –(সূরা আল-ইসরা, ১৭: ২৩)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা নিজের ইবাদতের অকাট্য নির্দেশের ঠিক পরপরই পিতা-মাতার প্রতি এহসান বা সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কত বড় ফরয ইবাদত। বিশেষ করে 'বার্ধক্য' (আল-কিবর) শব্দটির উল্লেখ করে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বৃদ্ধ বয়সে যখন মানুষশারীরিকভাবে দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন সন্তান তাঁদের ওল্ড হোমে পাঠিয়ে দিতে পারবে না; বরং নিজের ঘরে রেখে পরম মমতায় তাঁদের সেবা করতে হবে। সন্তানের সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশকেও আল্লাহ তাআলা বড় গুণাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইসলাম বৃদ্ধা মাকে কোনো বোঝা মনে করে না, বরং তাকে ঘরের বরকত এবং জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করে।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: বৃদ্ধা ও মায়ের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অতুলনীয় ভালোবাসা

সীরাতে ইবনে হিশাম এবং হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে সমাজকে শিখিয়েছেন কীভাবে প্রবীণ নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান ও মূল্যায়ন করতে হয়।

দুধমায়ের প্রতি অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা: জিনেদ বা হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে তাঁর শৈশবের দুধমা হযরত হালিমা সা'দিয়া (রা.) আগমন করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যন্ত আবেগের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নিজের গায়ের পবিত্র চাদরটি খুলে মা হালিমার বসার জন্য মাটির ওপর বিছিয়ে দিলেন এবং পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে 'আমার মা, আমার মা' বলে সম্বোধন করলেন।–(সীরাতে ইবনে হিশাম,সহীহ বুখারী,কিতাবুল আদাব; হাদীস নং: ৫৯৭১)

সাহাবীগণের পারিবারিক সম্প্রীতির রূপ: সীরাতের পাতায় দেখা যায়, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) গভীর রাতে মদীনার এক অন্ধ বৃদ্ধা নারীর ঘরে গিয়ে নিজ হাতে তাঁর ঘর পরিষ্কার করে দিতেন এবং খাবার রান্না করে দিয়ে আসতেন।
ইসলামের এই মহান আইনি ও নৈতিক কাঠামোর কারণে মুসলিম সমাজে 'ওল্ড হোম' বা বৃদ্ধাশ্রমের কোনো স্থান নেই। মুসলিম পরিবারে একজন বৃদ্ধা মা বা দাদী-নানী হলেন পুরো ঘরের কেন্দ্রবিন্দু, যাঁকে কেন্দ্র করে নাতি-নাতনীদের মাঝে মমতার বন্ধন গড়ে ওঠে।

পশ্চিমা নারীবাদ যেখানে নারীকে তথাকথিত স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে যৌবনে কর্পোরেট শোষণ করেছে এবং বার্ধক্যে তাকে নিঃসঙ্গতার ওল্ড হোমে নিক্ষেপ করেছে, ইসলাম সেখানে নারীকে পারিবারিক নিরাপত্তার এক আজীবন গ্যারান্টি দিয়ে তার প্রকৃত 'মর্যাদা' অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

পাঠ ৫.৭: "আধুনিক মিডিয়ায় নারীর অশ্লীল প্রদর্শন ও নৈতিক অবক্ষয়: 'হায়া'র গুরুত্বের বিপরীত মেরু"

১. আধুনিক প্রচারমাধ্যম ও নারীর সামগ্রিক অবমাননা: একটি কাঠামোগত পুঁজিবাদী সংকট

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী বাহন হলো বর্তমান যুগের গ্লোবাল মিডিয়া, বিনোদন জগৎ, হলিউড-বলিউড কালচার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো উগ্র নারীবাদী আন্দোলন যখন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং পোশাকের স্বাধীনতার নামে শালীনতার চিরন্তন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রাচীরকে ভেঙে দেয়, তখন আধুনিক পুঁজিবাদী মিডিয়া তাকে কোনো নারীর অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেনি। বরং তারা একে অত্যন্ত চতুরতার সাথে 'উন্মুক্ত প্রদর্শনীবাদ' বা এক্সিবিশনিজম হিসেবে বাণিজ্যিক স্বার্থে লুফে নেয়।

সমাজবিজ্ঞান, গণমাধ্যম তত্ত্ব এবং কালচারাল স্টাডিজের গভীর পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, বর্তমান মিডিয়া জগত নারীকে তাঁর মেধা, চিন্তাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সাহিত্যিক গুণ বা মানবিক সুকুমার বৃত্তির মাধ্যমে সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেনি; বরং তাঁর অবয়বকে সস্তা বিনোদন, চটকদার কাটতি এবং যৌন সুড়সুড়ি দেওয়ার প্রধান উপাদানে রূপান্তর করেছে।

সিনেমা, মিউজিক ভিডিও, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, ইন্টারনেট সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে নারীর শরীরকে যত বেশি নগ্ন বা অর্ধনগ্নভাবে প্রদর্শন করা যায়, কর্পোরেট পুঁজিপতিদের ভিউয়ারশিপ, ক্লিক-রেট, টিআরপি এবং লভ্যাংশ তত বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার এই চরম বিকৃত ও নোংরা রূপটি নারীকে সমাজের চোখে একজন সম্মানিত, বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ থেকে নামিয়ে কেবল একটি উপভোগ্য বস্তু বা অবজেক্টিফিকেশন এ পরিণত করেছে। এর ফলে সমাজে এক ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয় নেমে এসেছে, যা তরুণ প্রজন্মকে নৈতিকভাবে পঙ্গু ও চারিত্রিকভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে।

মিডিয়া আজ এক অলিখিত মনস্তাত্ত্বিক জাল বিছিয়েছে, যেখানে একজন নারীকে সফল বা আধুনিক হতে হলে প্রথম শর্তই হলো তাকে তাঁর শালীনতার পোশাক ত্যাগ করতে হবে। এই পুঁজিবাদী কমার্শিয়াল ডিক্টেটরশিপ নারীর মূল মর্যাদাকে হরণ করে তাকে বিনোদন জগতের দাসীতে পরিণত করেছে, যা নারীবাদের তথাকথিত 'মুক্তি'র এক নির্মম উপহাস।

২. নৈতিক অবক্ষয় ও অপরাধের বৈশ্বিক সমাজতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান এবং আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের ডাটা

গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া ও বিনোদন জগতে নারীর এই অশ্লীল প্রদর্শনের ফলে বিশ্বব্যাপী যে সামাজিক মহামারী, অপরাধপ্রবণতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তদারকি সংস্থা ও মেডিকেল জার্নালের পরিসংখ্যানে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে:

যৌন অপরাধ ও পর্নোগ্রাফির বৈশ্বিক বিস্তার:

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) এবং বৈশ্বিক অপরাধ সমীক্ষা রিপোর্টের সাম্প্রতিক ডাটা অনুযায়ী, যেসব সমাজে বা রাষ্ট্রে মিডিয়া, সিনেমা এবং ইন্টারনেটে নারীর অশ্লীল প্রদর্শনের হার যত বেশি, সেসব দেশে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ, গ্যাং রেপ এবং ইভটিজিংয়ের হার জ্যামিতিক হারে বেশি। বর্তমান ইন্টারনেট যুগে বিলিয়ন ডলারের পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি তরুণ সমাজের মনস্তত্ত্বকে এমনভাবে বিকৃত করছে যে, তারা বাস্তব জীবনে নারীদের প্রতি কোনো প্রকার মানবিক শ্রদ্ধা বা সম্মান বোধ করতে পারছে না। নারীদের তারা কেবলই যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের সস্তা মাধ্যম হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করেছে, যা পারিবারিক জীবনের শান্তিকে চিরতরে ধ্বংস করছে।

মানসিক হীনম্মন্যতা, অবসাদ ও বডি শেমিং-এর মেডিকেল ডাটা:

বিশ্ববিখ্যাত সাইকোলজিক্যাল সাময়িকী Psychology Today এবং ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালগুলোর গভীর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী, সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন Instagram, Tik Tok) এবং ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোতে ফিল্টার করা, কৃত্রিম ও

অবাস্তব শারীরিক সৌন্দর্যের লাগামহীন প্রদর্শনের কারণে বর্তমান যুগের সাধারণ কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে তীব্র মানসিক হীনম্মন্যতা বা বডি ডিসমরফিয়া এবং ক্লিনিকাল ডিপ্রেশন দেখা দিচ্ছে। তারা মিডিয়ার তৈরি করা তথাকথিত 'পারফেক্ট বডি' বা 'জিরো ফিগার'-এর কৃত্রিম ফাঁদে পড়ে নিজেদের স্বাভাবিক রূপ ও প্রকৃতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। এর ফলে পাশ্চাত্যের তরুণীদের মাঝে মারাত্মক খাদ্য ব্যাধি (যেমন Anorexia ও Bulimia), প্লাস্টিক সার্জারির ক্ষতিকর নেশা এবং চরম হতাশা থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। মিডিয়া নারীকে এক অলিখিত হীনম্মন্যতার শৃঙ্খলে বন্দি করেছে, যা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে চিরতরে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

রেফারেন্স: আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) সোশ্যাল মিডিয়া ও বডি ইমেজ রিসার্চ রিপোর্ট।

বিজ্ঞাপন খাতে নারীর চরম পণ্যকরণ:

বৈশ্বিক গণমাধ্যম তদারকি সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী,বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী প্রচারণার প্রায় ৭০% থেকে ৭৫% ক্ষেত্রে নারীর বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার চেয়ে তার বাহ্যিক অবয়ব ও শরীরকে পণ্য বিক্রির সস্তা চটক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাবান, পারফিউম, গাড়ি থেকে শুরু করে পুরুষদের শেভিং ক্রিমের বিজ্ঞাপনেও নারীর শরীর প্রদর্শন করা আজ পুঁজিবাদী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। এটি প্রমাণ করে যে, নারীবাদ ও পুঁজিবাদ মিলে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি, বরং তাকে সস্তা বিপণনের অনুষঙ্গে পরিণত করেছে।

৩. 'হায়া' বা লজ্জাশীলতার মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর ও কুরআনী দর্শন

পাশ্চাত্যের এই অবাধ প্রদর্শনীবাদ, মিডিয়ার নোংরা বাণিজ্য ও নৈতিক অরাজকতার সম্পূর্ণ বিপরীতে ইসলামী শরীয়াহ সমাজকে কলুষতামুক্ত রাখতে এবং নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে 'হায়া' বা লজ্জাশীলতার প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, লজ্জাশীলতা কোনো অবরুদ্ধতা, দাসত্ব বা আদিম দুর্বলতা নয়; বরং এটি হলো মানুষের প্রকৃত আভিজাত্য, পবিত্রতা এবং ঈমানের মূল চালিকাশক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিন সমাজকে নিজেদের দৃষ্টি, পোশাক ও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ....وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

'মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র।... এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..."
–(সূরা আন-নূর,২৪: ৩০-৩১)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, সমাজকে নৈতিক পতন এবং পশুতুল্য অরাজকতা থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের চোখের ওপর এবং পোশাকের ওপর এক পবিত্র আইনি ও সামাজিক সীমারেখা টেনে দিয়েছে। 'হায়া' বা লজ্জাশীলতা হলো মানুষের অন্তরের এমন এক অদৃশ্য সুরক্ষাকবচ, যা মানুষের মনকে কুচিন্তা এবং শরীরকে পাপাচার থেকে দূরে রাখে।
ইসলাম নারীকে নির্দেশ দিয়েছে তাঁর কৃত্রিম সাজসজ্জা, সৌন্দর্য ও শারীরিক কমনীয়তাকে বাইরের জগতের সস্তা প্রদর্শনী বা মিডিয়ার বাণিজ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে, তা ঘরের অভ্যন্তরে নিজের স্বামী ও মাহরামদের জন্য সংরক্ষণ করতে। এর ফলে, নারী বাইরের সমাজে কোনো সস্তা প্রদর্শনীর পণ্য বা ভোগ্যবস্তু হন না; বরং তিনি তাঁর মেধা, চরিত্র এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন সম্মানিত মানুষ হিসেবে মূল্যায়িত হন। এই লজ্জাশীলতার বিধান নারীকে সমাজে এক অনন্য আভিজাত্য, অপার্থিব সম্মান ও অস্পর্শনীয় 'মর্যাদা' দান করে, যা পশ্চিমা নারীবাদের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু।

৪. সারাত ও হাদাসের অকাট্য আলো: লজ্জাশালতার শ্রেষ্ঠতম ভূষণ ও সামাজিক স্বাস্ত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণী, পারিবারিক জীবন এবং মদীনার সমাজব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, ইসলামে হায়া বা লজ্জাশীলতাকে কতটা অলৌকিক ও বৈপ্লবিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:
الحياة لا يأتي إلا بخير

"লজ্জাশীলতা মানুষের জীবনে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না।"
–(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব; হাদীস নং: ৬১১৮)

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর রাসুল (সা.) হায়ার গুরুত্ব স্পষ্ট করে এরশাদ করেন:
"নিশ্চয়ই প্রত্যেক দ্বীনের বা জীবনব্যবস্থার একটি নিজস্ব বিশেষ চরিত্র বা মূল বৈশিষ্ট্য থাকে, আর ইসলামের সেই বিশেষ চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য হলো হায়া বা লজ্জাশীলতা।"
–(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল যুহদ; হাদীস নং: ৪১৮১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে পর্দার অন্তরালে থাকা কুমারী নারীদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ও বিনম্র ছিলেন। মদীনার পবিত্র সমাজে নারী সাহাবীগণের মূল সামাজিক শক্তিই ছিল এই হায়া ও হিজাব। সীরাতের বর্ণনামতে, তারা যখন মদীনার রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, তখন রাস্তার মাঝখান দিয়ে পুরুষদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে চলতেন না; বরং দেয়াল ঘেঁষে অত্যন্ত বিনম্র ও মর্যাদাপূর্ণভাবে চলতেন, যাতে তাঁদের পোশাক বা অবয়ব পুরুষদের কোনো প্রকার আকর্ষণের বা সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ না হয়।–(সীরাতে ইবনে হিশাম)

এই লজ্জাশীলতার এবং সামাজিক অনুশাসনের কারণেই মদীনার সমাজটি ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নিরাপদ, পবিত্র এবং অপরাধমুক্ত সমাজ। সেখানে কোনো পুলিশ বা আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই একজন নারী সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সম্মান ভোগ করতেন। আধুনিক মিডিয়া যেখানে মুনাফা ও স্বাধীনতার নামে নারীকে নগ্নতার প্রদর্শনীবাদে নামিয়ে পশুর স্তরে নামিয়েছে, ইসলাম সেখানে হায়া ও হিজাবের প্রাচীর তুলে নারীকে সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত, পবিত্র ও নিরাপদ আসনে অধিষ্ঠিত করে তাঁর প্রকৃত 'মর্যাদা' নিশ্চিত করেছে।

||৬ষ্ঠ অধ্যায়||

“আধুনিক সংশয় নিরসন ও ইসলাম বনাম নারীবাদের আদর্শিক সংঘাত”

পাঠ ৬.১: “হিজাব ও পর্দা: নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বনাম আধ্যাত্মিক সুরক্ষা ও সম্মান”

১. আধুনিক সংশয় এবং 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'র নারীবাদী বয়ান

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন এবং সমকালীন নারীবাদী প্রোপাগান্ডায় ইসলামের হিজাব ও পর্দার বিধানকে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যবস্তু করা হয়। পশ্চিমা নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ অত্যন্ত সুকৌশলে হিজাবকে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা , মানবাধিকার এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী একটি 'মধ্যযুগীয় ও পুরুষতান্ত্রিক শোষণের প্রতীক' হিসেবে উপস্থাপন করে। তাদের মূল বয়ান হলো, পোশাকের ক্ষেত্রে নারীর নিরঙ্কুশ ও লাগামহীন স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং তার শরীর প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তার নিজস্ব।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্বাধীনতা মূলত সমাজকে এক অবাধ যৌন অরাজকতা এবং চরম বস্তুবাদের দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে নারীর প্রকৃত মানবিক সম্মান হারিয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় পোশাকের এই অবাধ স্বাধীনতার চতুরি ঢাকতে গিয়ে তারা নারীকে অবচেতনভাবেই কর্পোরেট বিজ্ঞাপন ও বিনোদন জগতের কমার্শিয়াল পণ্যে রূপান্তর করেছে। স্বাধীনতার এই চটকদার ও মোহময় সস্তা স্লোগান নারীকে সাময়িক আধুনিকতার বিভ্রম দিলেও, কার্যত তা তার চারপাশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুরক্ষাকবচকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।

২. হিজাব : আধ্যাত্মিক সুরক্ষা ও 'তাকওয়া'র মনস্তত্ত্ব

ইসলামী শরীয়াহ হিজাব বা পর্দাকে কোনো বাহ্যিক জোরজুলুম, সামাজিক নিষেধাজ্ঞা বা অবরুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে দেখে না। বরং একে মানুষের আভিজাত্য, আধ্যাত্মিক

সুরক্ষা এবং আল্লাহর বন্দেগীর এক মহান বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সাব্যস্ত করে। ইসলামে হিজাবের দর্শন কেবল একটি কাপড়ের টুকরো বা পোশাকের আবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মূলত অন্তরের পবিত্রতা বা 'তাকওয়া'র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং যা সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ। আর তাকওয়ার ও(খোদাভীতির) যে পোশাক, সেটিই সর্বোত্তম।" –(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৬)

আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক পোশাকের চেয়ে অন্তরের পোশাক বা 'তাকওয়া'কে সর্বোত্তম বলেছেন। হিজাব হলো অন্তরের সেই তাকওয়া বা লজ্জাশীলতারই একটি বাহ্যিক প্রতিফলন। যখন একজন নারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজাব পরিধান করেন, তখন তিনি তাঁর আত্মাকে এক অনন্য আধ্যাত্মিক সুরক্ষায় আবৃত করেন।

হিজাব পরিধানের মাধ্যমে নারী এই ঘোষণা দেন যে, তিনি কোনো সস্তা প্রদর্শনীর পণ্য বা পুরুষের কামুক দৃষ্টির ভোগ্যবস্তু নন; বরং তিনি আল্লাহর একজন সম্মানিত বান্দা, যাঁর মূল্যায়ন তাঁর বহিরাঙ্গনের রূপের ওপর নয়, বরং তাঁর চরিত্র, মেধা ও আমলের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এটি নারীকে এক পরম মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি ও আভিজাত্য দান করে, যা আধুনিক কোনো দর্শন দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

৩. কুরআনী বিধানের স্পষ্ট রূপরেখা এবং 'জিলবাব'-এর আইনি সুরক্ষা

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক চলাফেরা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে হিজাবের বিধানের মাধ্যমে অত্যন্ত নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নারীদের সুরক্ষায় 'জিলবাব' বা বড় চাদরের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن

فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত (নির্যাতন বা কষ্ট) করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯)

'জিলবাব' পরিহিত একজন নারীকে সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন সম্মানিত, পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে সমাজের কোনো লম্পট বা বখাটে পুরুষ তাকে কোনো প্রকার কুপ্রস্তাব বা উত্যক্ত করার সাহস পায় না। হিজাব কোনো পরাধীনতার দেয়াল নয়, বরং এটি হলো নারীর চারপাশের একটি অভেদ্য আইনি ও সামাজিক সুরক্ষাপ্রাচীর ।

পুঁজিবাদ যেখানে মুনাফার স্বার্থে নারীকে নগ্ন করে রাস্তায় নামাতে চায়, ইসলাম সেখানে হিজাবের নিখুঁত সুরক্ষাকবচ দিয়ে নারীর ব্যক্তিগত সম্মান ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে। হিজাব পরিধান করে একজন নারী পুরুষতান্ত্রিক লোলুপ দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষার বৃহত্তর ময়দানে নিজের অবদান রাখতে পারেন।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: হিজাব পালনে নারী সাহাবীগণের অভূতপূর্ব আকুলতা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজাব ও পর্দার বিধান যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন নারী সাহাবীগণ (রা.) একে কোনো বোঝা বা স্বাধীনতা হরণ মনে করেননি; বরং তাঁরা একে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান উপহার ও সম্মান হিসেবে পরম আকুলতায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্ত: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহ তাআলা আনসারী নারীদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। যখন সূরা আন-নূরের পর্দা সংক্রান্ত আয়াত (যা নারীদের চাদর দিয়ে বুক ও শরীর আবৃত করার নির্দেশ দেয়) অবতীর্ণ হলো, তখন তাঁরা বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে নিজেদের ঘরের চাদর ও কাপড়ের পাড় কেটে তা দিয়ে ওড়না ও হিজাব তৈরি করে নিজেদের আবৃত করে নিলেন এবং সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে ফজরের সালাতে শরিক হলেন।"
–(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর; হাদীস নং: ৪৭৫৮) ।
নারী সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে উম্মে আম্মারা (রা.)-এর মতো বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার সময়ও নিজেদের মাথার হিজাব ও শালীনতা রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।–(সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড: ২)

ইসলামের এই স্বর্ণালী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, হিজাব মুসলিম নারীর স্বকীয়তা, আত্মমর্যাদা এবং আভিজাত্যের প্রধানতম অলঙ্কার, যা তাকে আধুনিক জাহেলিয়াত ও প্রদর্শনীবাদ থেকে মুক্ত করে এক চিরন্তন ঐশী মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

পাঠ ৬.২: "বহুবিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আধুনিক অভিযোগের বাস্তবসম্মত জবাব"

১. আধুনিক নারীবাদী আখ্যান এবং বহুবিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত অভিযোগ (সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত রূপ)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন এবং সমকালীন উগ্র নারীবাদী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের অন্যতম প্রধান দুটি লক্ষ্যবস্তু হলো ইসলামী পারিবারিক আইনের অন্তর্গত 'বহুবিবাহ' এবং 'তালাক' সংক্রান্ত বিধানাবলী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের পশ্চিমা নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ (যেমন জুডিথ বাটলার, মেরী ডেইলী বা কেট মিলেট) তাঁদের বিভিন্ন সমাজবৈজ্ঞানিক ও লিঙ্গভিত্তিক তত্ত্বে দাবি করেন যে-ধর্মীয় পারিবারিক আইনগুলো মূলত লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

এই তাত্ত্বিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমকালীন বৈশ্বিক নারীবাদী সংগঠনগুলো এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রচারণায় ইসলামী বহুবিবাহকে পুরুষের সীমাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত কামলিলার একটি আইনসম্মত হাতিয়ার, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের চরম বহিঃপ্রকাশ এবং নারীর মানবিক মর্যাদা ও আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার করা হয়। তাদের মূল আখ্যান হলো, বহুবিবাহ একই ছাদের নিচে নারীদের মধ্যে এক অস্বাস্থ্যকর মানসিক প্রতিযোগিতা, পারিবারিক নির্যাতন ও হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়, যা আধুনিক 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি' বা লিঙ্গ সমতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

একইভাবে, ইসলামের তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের আইনি রূপরেখাকে নারীবাদী আখ্যানে পুরুষের একপেশে স্বৈরাচারী ক্ষমতা এবং নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক চরম আইনি জুলুম হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডায় অভিযোগ তোলা হয় যে, ইসলামী আইন পুরুষকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে মৌখিক বা লিখিতভাবে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে। তাদের মতে, তালাকের এই বিধানটি নারীকে বৈবাহিক সম্পর্কের ভেতর এক স্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রাখে, যা নারীর মানবাধিকার ও আইনি স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে।

জাতিসংঘের সিডও (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) সনদের ১৬ নং অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন পশ্চিমা এনজিও-র রাজনৈতিক এজেন্ডায় প্রতিনিয়ত মুসলিম দেশগুলোর ওপর এই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যেন তারা বহুবিবাহকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তালাকের শারঈ আইন বাতিল করে পশ্চিমা ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ আইনি কাঠামো গ্রহণ করে।
কিন্তু এই আধুনিক নারীবাদী আখ্যানটি মানব প্রকৃতির গভীর মনস্তত্ত্ব, জীববৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্য এবং সমকালীন পশ্চিমা সমাজের চরম নৈতিক ও পারিবারিক ট্র্যাজেডিকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে এক ধরণের কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিক অন্ধত্ব তৈরি করতে চায়। ইসলাম সমাজকে কোনো অবাস্তব ও বায়বীয় কল্পনার ওপর ভিত্তি করে শাসন করে না; বরং এটি মানুষের জৈবিক বাস্তবতা, আপদকালীন সামাজিক সংকট এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাকে সুনিপুণভাবে মেনে নিয়ে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ আইনি কাঠামো দেয় যা

সমাজকে গোপন ব্যভিচার, অবৈধ সম্পর্ক, জারজ সন্তানের আধিক্য এবং চরম সামাজিক অরাজকতা থেকে রক্ষা করে নারীর দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিশ্চিত করে।

২. বহুবিবাহের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক হিকমত: সমকালীন বৈশ্বিক বাস্তবতা

ইসলামে বহুবিবাহ কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম বা সাধারণ প্রথা নয়; বরং এটি হলো বিশেষ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে সমাজকে পচন থেকে রক্ষা করার একটি নিখুঁত আইনি বিকল্প বা সুরক্ষাকবচ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে 'ইনসাফ' বা সমতার শর্ত জুড়ে দিয়ে ইরশাদ করেছেন:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً "তবে তোমরা তোমাদের পছন্দমত নারীদের বিয়ে করো-দুটি, তিনটি কিংবা চারটি। আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে (তাদের মাঝে) ইনসাফ বা সমতা কায়েম করতে পারবে না, তবে একটিই বিয়ে করো।" –(সূরা আন-নাসা, ৪:৩)

এ আয়াতে মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগের অনিয়ন্ত্রিত ও শর্তহীন বহুবিবাহের প্রথা বিলুপ্ত করে এর সর্বোচ্চ সীমা চারটিতে নির্ধারণ করেছে এবং একই সাথে স্ত্রীদের মাঝে আবাসন, অন্ন, বস্ত্র ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিখুঁত সমতা বজায় রাখাকে আইনি শর্ত হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছে। সমকালীন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহের হিকমত নিচে আলোচনা করা হলো:

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ভারসাম্য ও যুদ্ধবিদ্ধস্ত সমাজ: যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যখন সমাজে পুরুষের সংখ্যা নারীদের তুলনায় আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় (যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে ঘটেছিল), তখন বহুবিবাহই একমাত্র আইনি ও প্রাকৃতিক সমাধান। যদি পুরুষকে কেবল এক বিয়ের আইনে আটকে রাখা হয়, তবে লাখ লাখ নারী স্বামী, পরিবার ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজকে ব্যভিচার ও অবৈধ সম্পর্কের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য হন। ইসলাম গোপনে উপপত্নী

(Mistress) রাখার পশ্চিমা সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দ্বিতীয় স্ত্রীকে পূর্ণ সামাজিক ও আইনি অধিকার দিয়ে তার 'মর্যাদা' রক্ষা করে।

শারীরিক ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতা: অনেক সময় প্রথম স্ত্রীর মারাত্মক দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা বা বন্ধ্যাত্বের কারণে (যেখানে তিনি দাম্পত্য জীবন পরিচালনায় অক্ষম হন) স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ের প্রয়োজন বোধ করেন, তবে ইসলাম প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে তাকে পূর্ণ সম্মান ও ভরণপোষণ দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়। পশ্চিমা সমাজ প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করার বা গোপনে অবৈধ সম্পর্ক রাখার পথ বেছে নেয়, যা নারীর সাথে চরম প্রতারণা। ইসলাম এখানে আইনসম্মত ও ইনসাফপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে সমাজকে রক্ষা করে।

৩. তালাক আইনের ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন ও 'খুলা'র মাধ্যমে নারীর আইনি অধিকার

পশ্চিমা নারীবাদ যেখানে পরিবার প্রথাকে দুর্বল করে তুচ্ছ কারণে ডিভোর্স কালচারকে একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করেছে, ইসলাম সেখানে তালাককে সবচেয়ে অপ্রিয় কিন্তু অনিবার্য শেষ সমাধান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলাম প্রথম দিন থেকেই বিবাহবিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটাতে পারিবারিক সালিশী ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর যখন সম্পর্কটি এক নরকযন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়, তখন জোরপূর্বক একসাথে থাকতে বাধ্য করা মানুষের মনস্তত্ত্ব ও শান্তির পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان

"তালাক হলো দুই বার। তারপর হয় তো উত্তম পন্থায় রেখে দেবে, না হয় সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দেবে।" –(সূরা আল-বাকারাহ, ২:২২৯)

আইন ও ইনসাফ: ইসলাম তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষকে ক্ষমতা দিলেও তা হুট করে কার্যকর করার অনুমতি দেয় না; বরং 'ইদ্দত' (তিন মাস) এবং ক্রমান্বয়ে তিন তুহুরে তিন তালাকের বিধান দিয়ে প্রত্যাহারের (রুজু) এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক সুযোগ সৃষ্টি

করে। সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক বিষয় হলো, ইসলাম তালাকের একক ক্ষমতা কেবল পুরুষকে দেয়নি; বরং নারী যদি স্বামীর সাথে সংসার করতে অপছন্দ করেন বা কোনো কারণে অত্যাচারিত হন, তবে তিনি আদালতের মাধ্যমে 'খুলা' বা বিয়ের চুক্তি বাতিলের পূর্ণ আইনি অধিকার রাখেন।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: বহুবিবাহ ও খুলার বাস্তব ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

সীরাতে ইবনে হিশাম এবং হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন এবং মদীনার আইনি সমাজব্যবস্থায় বহুবিবাহ ও তালাক/খুলা কীভাবে নারীর মর্যাদা রক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বহুবিবাহের সামাজিক ও রাজনৈতিক হিকমত:
সীরাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) ২৫ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর যৌবনের দীর্ঘ সময় কেবল একজন প্রবীণ স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথেই অতিবাহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি যেসব বিয়ে করেছিলেন, তার প্রায় প্রতিটিই ছিল সামাজিক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক কারণে। হযরত সওদা (রা.)-এর মতো প্রবীণ বিধবা নারী, যাঁদের স্বামীরা হিজরতের পর মারা যান এবং যারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের আশ্রয় ও সামাজিক 'মর্যাদা' দেওয়ার জন্য বিয়ে করেছিলেন। –(সীরাতে ইবনে হিশাম)।

ইসলামে খুলার প্রথম ঐতিহাসিক আইনি নজির:
সহীহ বুখারীর কিতাবুত তালাক-এ বর্ণিত একটি ঘটনা ইসলামের নারী অধিকারের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। সাহাবী হযরত ছাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী জামিলা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার স্বামীর চরিত্র বা দ্বীনদারীর ওপর কোনো দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু আমি তাঁর চেহারা ও অবয়ব অপছন্দ করি এবং মুসলিম হয়ে কুফরীতে (অকৃতজ্ঞতায়) লিপ্ত হতে চাই না।" রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মনস্তাত্ত্বিক কষ্ট বুঝতে পেরে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হননি। তিনি জামিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তাঁর দেওয়া মহরের বাগানটি ফেরত দেবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, দেব।" তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) স্বামীকে নির্দেশ দিলেন বাগানটি

গ্রহণ করে স্ত্রীকে আইনিভাবে মুক্ত করে দিতে। –(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক; হাদীস নং: ৫২৭৩)।

ইসলামে বহুবিবাহ ও তালাকের বিধান মূলত পুরুষতন্ত্রের কোনো হাতিয়ার নয়; বরং তা মানবীয় বাস্তবতার আলোকে সমাজকে ব্যভিচার ও পচন থেকে রক্ষা করার এবং নারীদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধিকার নিশ্চিত করার এক নিখুঁত ও ইনসাফপূর্ণ ঐশী সুরক্ষাকবচ।

পাঠ ৬.৩: "সাক্ষী ও উত্তরাধিকার নিয়ে নারীবাদের সমালোচনার শারঈ ও যুক্তিনির্ভর খণ্ডন"

১. আধুনিক নারীবাদী আখ্যান ও লিঙ্গ সমতার নামে সমালোচনা

সমকালীন নারীবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের অন্যতম প্রধান দুটি লক্ষ্যবস্তু হলো ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্তর্গত 'নারীর সাক্ষ্য' এবং 'উত্তরাধিকার' সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী। পশ্চিমা নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ এবং জাতিসংঘের সিডও (CEDAW) সনদের প্রবক্তাগণ দাবি করেন যে-আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে "দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য হওয়া এবং মিরাস বা উত্তরাধিকার বণ্টনে "পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ ভাইয়ের অংশের অর্ধেক" হওয়া স্পষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য।
তাদের মূল আখ্যা হলো, এই আইনগুলো নারীর মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাকে খাটো করে এবং তাকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে। তারা মুসলিম দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে যেন এই শারঈ ফারায়িজ ও দেওয়ানী আইন বাতিল করে পশ্চিমা ধাঁচের গাণিতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এই নারীবাদী সমালোচনাটি ইসলামী অর্থনীতি, সমাজকাঠামো এবং ইসলামের নিখুঁত 'ইনসাফ' ও দায়িত্বভিত্তিক বণ্টন দর্শন বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম সমাজকে কেবল শুষ্ক গাণিতিক সমতার দাঁড়িপাল্লায় মাপে না; বরং এটি দায়িত্ব ও সুরক্ষার ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে এক অনন্য ইনসাফপূর্ণ সমাজ কায়েম করে।

২. ইসলামী সাক্ষ্য আইনের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শন: সুরক্ষার তত্ত্ব

ইসলামে সাক্ষ্য বা সাক্ষ্যদান কোনো বিশেষ সুবিধা, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক অধিকার নয়; বরং এটি একটি অত্যন্ত কঠিন আইনগত ও সামাজিক দায়িত্ব, যা মানুষের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআনে আর্থিক লেনদেনের দলিলে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى

"আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী রাখো। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী-তোমাদের পছন্দমত সাক্ষীদের মধ্য থেকে। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।" –(সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮২)

এই বিধানটি কেবল জটিল বাণিজ্যিক ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা প্রাক-ইসলামী জাহেলী আরব সমাজে এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ঘরের বাইরে পুরুষের মূল বিচরণক্ষেত্র ছিল। ইসলাম নারীকে ঘরের বাইরে গিয়ে দীর্ঘ ও জটিল ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, ঋণের চুক্তি বা আদালতের বারান্দায় গিয়ে পুরুষের মুখোমুখি হওয়ার মানসিক ও আইনি চাপ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে।
এখানে 'ভুলে যাওয়া' (আন্ তাদিল্লা) শব্দটির অর্থ নারীর বুদ্ধির কমতি নয়; বরং এটি হলো আর্থিক বিষয়ে নারীর অভ্যস্ততা ও মনোযোগের সাধারণ পরিবেশের অভাব এবং মনস্তাত্ত্বিক সুরক্ষার এক নিখুঁত রূপরেখা। যদি একজন নারী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কোনো কারণে বিভ্রান্ত বা ট্রমার শিকার হন, তবে অন্যজন তাকে শান্ত করতে ও স্মরণ করিয়ে দিতে পারবেন।

সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক সত্য হলো, ইসলাম সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যকে অর্ধেক করেনি। বরং যেসব বিষয়ে কেবল নারীরাই অভিজ্ঞ (যেমন সন্তানের জন্ম, প্রসূতি বিষয়, কুমারীত্ব পরীক্ষা বা হিজাবের ভেতরের অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিষয়), সেসব ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে কেবল একজন নারীর সাক্ষ্যই চূড়ান্ত এবং সেখানে পুরুষের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ

অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং, এটি কোনো বৈষম্য নয়, বরং দায়িত্বভিত্তিক নিখুঁত সামাজিক ভারসাম্য।

৩. উত্তরাধিকার (মিরাস) আইনের ইনসাফ ও অর্থনৈতিক দর্শনের খণ্ডন

মিরাস বা উত্তরাধিকার বণ্টনে সূরা আন-নিসার **১১** নম্বর আয়াতের একটি অংশ- الذكر৷ مثل حظ الأنثيين৷ ("এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান')-কে কেন্দ্র করে নারীবাদীরা ইসলামকে নারী অধিকারের পরিপন্থী বলে প্রচার করে। কিন্তু সামগ্রিক ইসলামী অর্থনীতির ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন দর্শন এবং ইনসাফের আলোতে এর প্রকৃত যৌক্তিক রূপটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

আর্থিক দায়িত্বের ভারসাম্যপূর্ণ সমীকরণ:
ইসলামী পারিবারিক আইনে পুরুষকে তার নিজের, স্ত্রীর, সন্তানদের, প্রবীণ পিতা-মাতার এবং পরিবারের সমস্ত অভাবী নারীর ভরণপোষণ (নফকা) দিতে আইনি ও ধর্মীয়ভাবে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে, একজন নারী উত্তরাধিকার সূত্রে যা পান, তা সম্পূর্ণ তার একক নিরঙ্কুশ মালিকানায় থাকে। তিনি চাইলে তা নিজের ইচ্ছামতো সম্পূর্ণ সঞ্চয় করতে পারেন, ব্যবসা করতে পারেন বা দান করতে পারেন; স্বামী বা পিতা সেখানে জোরপূর্বক এক টাকাও নিতে পারেন না।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: মিরাস ও সাক্ষ্য আইনের বৈপ্লবিক সূচনা

প্রাক-ইসলামী জাহেলী আরবে নারী ও শিশুদের মিরাস থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হতো। ইসলাম এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটিয়ে নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা সুরক্ষিত করেছে।

ইসলামে প্রথম মিরাস বণ্টনের :
উহুদ যুদ্ধে সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে রবী' (রা.) শহীদ হওয়ার পর তাঁর ভাই জাহেলী নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং সা'দের বিধবা স্ত্রী ও দুই কন্যাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেয়। সা'দের স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে এই আকুল আবেদন জানান। তখন আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নিসার মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ

করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সা'দের ভাইকে ডেকে নির্দেশ দিলেন: 'সা'দের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সম্পত্তি দাও, তাঁর স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ (১/৮) দাও এবং অবশিষ্টাংশ তুমি নাও।"
–(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল ফারায়িজ, হাদীস নং: ২৮৯১ (সহীহ সনদ)।
পশ্চিমা বিশ্ব যখন নারীকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রাখছিল, ইসলাম তার ১৪০০ বছর আগেই নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও পারিবারিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

পাঠ ৬.৪: 'ইসলামী নারীবাদ' : একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ ও ঈমানী সংকট

১. 'ইসলামী নারীবাদ' ধারণার উৎপত্তি ও ছদ্মবেশী রূপ

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৈশ্বিক সেক্যুলার ও লিবারেল বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে একটি নতুন ও চতুর তাত্ত্বিক ধারণার জন্ম দেওয়া হয়, যা বর্তমান অ্যাকাডেমিক বিশ্বে 'ইসলামী নারীবাদ' বা 'ইসলামিক ফেমিনিজম' নামে পরিচিত। এই ধারণার প্রবক্তাগণ এবং সমকালীন কিছু পশ্চিমা অর্থায়নে পুষ্ট এনজিও ও বুদ্ধিজীবী দাবি করেন যে-ঐতিহ্যগত ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিকহ) এবং মুফাসসিরগণের তাফসীর মূলত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত।

তাই তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাঠগুলোকে পশ্চিমা আধুনিক লিঙ্গ সমতার ছাঁচে ফেলে নতুনভাবে ব্যাখ্যা বা রি-রিডিং করার দাবি তোলেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো, ইসলামের ভেতর থেকেই হিজাব, মিরাস বা উত্তরাধিকার আইন, বহুবিবাহ এবং পারিবারিক শৃঙ্খলার অমোঘ শারঈ বিধানগুলোকে সংস্কারের নামে আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়ানো।

বাহ্যিকভাবে এই আন্দোলনটিকে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য 'ইসলামী' তকমা ব্যবহার করা হলেও, তাত্ত্বিক ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অত্যন্ত সুনিপুণ ছদ্মবেশী বুদ্ধিবৃত্তিক ফাঁদ। কারণ, নারীবাদ বা ফেমিনিজম এবং ইসলাম-এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মেরুর আদর্শ। নারীবাদ গড়ে উঠেছে মানুষের তৈরি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সেক্যুলারিজম এবং স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে, ইসলাম গড়ে উঠেছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, ওহী (ঐশী বাণী) এবং তাঁর বিধানের সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের (বন্দেগী) ওপর ভিত্তি করে।

সুতরাং, এই দুটি পরস্পরবিরোধী দর্শনকে জোড়াতালি দিয়ে 'ইসলামী নারীবাদ' নামক সংকর বা হাইব্রিড মতবাদ তৈরি করা মূলত ইসলামের মৌলিক রূপকে বিকৃত করার এক আধুনিক অ্যাকাডেমিক ষড়যন্ত্র, যা মুসলিম নারীদের মনস্তত্ত্বে এক গভীর আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বা আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করছে।

২. ইসলামী নারীবাদের ভেতরের 'ঈমানী সংকট' ও অসারতা

'ইসলামী নারীবাদ' ধারণার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, এটি কেবল একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক মতবাদ নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক নীরব কিন্তু ভয়াবহ ঈমানী সংকট :

ওহী বা ঐশী বাণীর ওপর আধুনিকতাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ: এই মতবাদের অনুসারীগণ পরোক্ষভাবে এই দাবি করেন যে, চৌদ্দশত বছর ধরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যে দ্বীন ও পারিবারিক আইন উম্মাহকে দিয়েছেন, তা আধুনিক যুগের উপযোগী নয়। তাঁদের এই মানসিকতা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা ঈমানের মূল ভিত্তির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করে ইরশাদ করেছেন

اليوم أكملت لكم دينكم

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।"
–(সূরা আল-মায়েদাহ, ৫: ৩)

দ্বীনের আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন: ইসলামী নারীবাদীগণ নিজেদের মনমতো কেবল সেই নির্দেশগুলো গ্রহণ করতে চান যা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকূলে যায়, আর

যেসব শারঈ বিধান (যেমন হিজাবের আবশ্যকতা বা মিরাসের অংশ) তাঁদের ধারণার বিপরীত মনে হয়, সেগুলোকে তাঁরা 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' বা 'পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই মানসিকতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরশাদ করেছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍۚ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো?" –(সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৮৫)

ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ইলাহ বা মাবুদ বানানো: নারীবাদের মূল সুর হলো মানুষের নিজের ইচ্ছাই চূড়ান্ত আইন। যখন একজন মুসলিম নারী নিজের নফস বা ইচ্ছাকে আল্লাহর অকাট্য বিধানের ওপরে স্থান দেন, তখন তিনি অবচেতনভাবেই এক ধরণের অদৃশ্য শিরক বা ঈমানী বিচ্যুতিতে পতিত হন।

৩. ফিকহী ঐতিহ্য এবং ওহীর শ্রেষ্ঠত্বের তাফসীরী ও আইনি খণ্ডন

ইসলামী শরীয়াহর মূল সৌন্দর্য হলো এর বিধানগুলো মানুষের তৈরি কোনো পরিবর্তনশীল সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার চিরন্তন ও নিখুঁত ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নিজস্ব খেয়ালখুশির ওপর ভিত্তি করে দ্বীনের ব্যাখ্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে ইরশাদ করেছেন:

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

“আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যাতে আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার কোনো অংশ থেকে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" –(সূরা আল-মায়েদাহ, ৫:৪৯)

 আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের ওপর মানুষের তৈরি কোনো যুগের সাময়িক ধ্যান-ধারণা, দর্শন বা মনস্তত্ত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। ইসলামী ফিকহ ও আইনশাস্ত্রের মূল ভিত্তি হলো-আল্লাহর হিকমত বা প্রজ্ঞা মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধির চেয়ে কোটি গুণ উর্ধ্বে। ইসলামী নারীবাদীরা ফিকহী ঐতিহ্যকে 'পুরুষতান্ত্রিক' বলে যে আক্রমণ করে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের কঠোর বৈজ্ঞানিক উসুল এর ওপর ভিত্তি করে, কোনো লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের ওপর ভিত্তি করে নয়। ইসলাম নারীকে যে 'মর্যাদা' ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছে, তা কোনো সংকর মতবাদের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহর আইন নিজেই চিরন্তন আধুনিক ও ইনসাফপূর্ণ।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: উম্মাহর নারী স্কলারদের বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

'ইসলামী নারীবাদ' ধারণার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক জবাব নিহিত রয়েছে ইসলামের নিজস্ব ইলমী ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মাঝে। পাশ্চাত্য নারীবাদ দাবি করে যে, নারীদের ইতিহাস পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, নারীগণ প্রথম দিন থেকেই ইলমে দ্বীন এবং ফিকহ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন, কোনো কৃত্রিম নারীবাদী আন্দোলনের সাহায্য ছাড়াই।

 ইসলামের ইতিহাসে কোনো নারী স্কলার বা মুহাদ্দিসা কখনোই আল্লাহর দেওয়া পর্দা, মিরাস বা কোনো বিধানকে নারী অধিকারের পথে বাধা মনে করেননি; বরং তাঁরা হিজাবের ভেতরে থেকেই উম্মাহকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

 অতএব, 'ইসলামী নারীবাদ' কোনো মুক্তির পথ নয়; বরং এটি হলো মুসলমানদের ঈমানী চেতনা ও মনস্তত্ত্বকে ধ্বংস করার একটি চতুর অ্যাকাডেমিক এজেন্ডা। ইসলামে নারীর মর্যাদা কোনো পশ্চিমা সংজ্ঞার মুখাপেক্ষী নয়, ওহীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাঝেই রয়েছে মুসলিম নারীর প্রকৃত আভিজাত্য, মুক্তি ও সম্মান।

পাঠ ৬.৫: “নারীবাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা বনাম ইসলামি বন্দেগী: সুখ ও শান্তির মাপকাঠি”

১. আধুনিক নারীবাদের 'স্বাধীনতা'র সংজ্ঞা: নফস ও বাসনার দাসত্ব

আধুনিক সেক্যুলার ও উগ্র নারীবাদী দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' এবং 'নিরঙ্কুশ পোশাক ও শারীরিক স্বাধীনতা'র (My Body My Choice) ধারণা। এই মতবাদ অনুযায়ী, মানুষের নিজের জীবন এবং শরীরের ওপর অন্য কোনো ঐশী শক্তি, সমাজ বা পরিবারের আইন খাটবে না; মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই তার জীবনের চূড়ান্ত চালিকাশক্তি। নারীবাদীদের আখ্যানে স্বাধীনতা বলতে বোঝানো হয়-যেকোনো ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক শৃঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজের খেয়ালখুশি ও বাসনা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা।

কিন্তু সমকালীন সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পশ্চিমা নারীবাদের এই 'স্বাধীনতা'র সংজ্ঞা মূলত মানুষকে এক চোরাবালির দিকে ঠেলে দেয়। যা স্বাধীনতার নামে মানুষের মনস্তত্ত্বকে 'নফস' বা পাশবিক বাসনার চরম দাসত্বে পরিণত করে। যখন একটি সমাজে মানুষের নিজের ইচ্ছাই মাবুদ বা ইলাহ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেখানে চিরন্তন নৈতিকতা ও লজ্জাশীলতার প্রাচীর ধসে পড়ে।
পুঁজিবাদ এই লাগামহীন স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে নারীকে ঘরের বাইরে এনে কর্পোরেট বিশ্বের খাটুনি খাটা শ্রমিকে পরিণত করেছে এবং তাঁর সৌন্দর্যকে বাজারের পণ্য বিক্রির অনুষঙ্গ বানিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, আধুনিক নারী বাহ্যিকভাবে স্বাধীন হওয়ার এক মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে তাঁর ভেতরের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা, মাতৃত্বের চিরন্তন গৌরব এবং পরম আত্মিক শান্তিকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন। নারীবাদের এই তথাকথিত মুক্তি মূলত নারীর জীবনে এক প্রচ্ছন্ন মানসিক দাসত্ব ও চরম অতৃপ্তির জন্ম দিয়েছে।

২. ইসলামের 'বন্দেগী' : আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তি

পাশ্চাত্যের এই ক্ষণস্থায়ী ও বিভ্রান্তিকর স্বাধীনতার বিপরীতে ইসলাম মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে 'বন্দেগী' বা আল্লাহর পরম দাসত্বের (Absolute Servitude to Allah) । মানুষ জন্মগতভাবেই সৃষ্টি এবং সে কখনোই সম্পূর্ণ স্বাধীন বা আইনহীন হতে পারে না; সে আল্লাহর আইন না মানলে অবধারিতভাবে নিজের কুপ্রবৃত্তি, সমাজ, রাষ্ট্র বা কোনো পুঁজিপতির দাসত্বে লিপ্ত হবে। অতএব, প্রকৃত মুক্তি কোনো আইনহীনতার মাঝে নেই; বরং প্রকৃত মুক্তি নিহিত রয়েছে সমস্ত জাগতিক ক্ষমতার দাসত্বকে অস্বীকার করে একমাত্র মহাবিশ্বের মহান আল্লাহর দাসত্ব বা বন্দেগী স্বীকার করার মাঝে।

ইসলামী দর্শনে একজন মুসলিম নারীর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর বেঁধে দেওয়া শারঈ সীমানার ভেতরে থেকে নিজের জীবনকে সাজানো। এই বন্দেগীর দর্শন নারীকে এক অনন্য মনসিক শক্তি ও পরম আভিজাত্য দান করে। একজন বিশ্বাসী নারী যখন আল্লাহর বন্দেগীতে মগ্ন হন, তখন তিনি সমস্ত দুনিয়াবী শক্তির তৈরি করা কৃত্রিম সৌন্দর্য বা কর্পোরেট মূল্যায়নের মাপকাঠিকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস অর্জন করেন। তিনি জানেন, সমাজের কোনো পুরুষ বা পুঁজিপতি তাঁর ভাগ্য বা মর্যাদার নিয়ন্তা নন; তাঁর মর্যাদা নির্ধারিত হয় একমাত্র আল্লাহর দরবারে তাঁর তাকওয়া ও আমলের মাধ্যমে। বন্দেগীর এই অবিনশ্বর চেতনা নারীকে জাগতিক সমস্ত শোষণ ও হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত করে এক পরম আত্মিক শান্তি, মানসিক দৃঢ়তা ও চিরস্থায়ী গৌরবময় জীবন নিশ্চিত করে।

৩. সুখ ও শান্তির প্রকৃত মাপকাঠি

সুখ ও শান্তি কোনো বস্তুগত প্রাচুর্য, যথেচ্ছ জীবনযাপন কিংবা শরীরের প্রদর্শনীর মাঝে অর্জিত হয় না; এটি হলো অন্তরের এক ঐশী প্রশান্তি, যা কেবল স্রষ্টার সাথে আত্মিক সংযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুখ ও শান্তির এই আসল চাবিকাঠি ও মাপকাঠি ঘোষণা করে স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فللحبيئة حياة طيبة والتجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

"মুমিন হয়ে পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে কেউ সৎকাজ করবে, আমি অবশ্যই তাকে এক পবিত্র ও সুখী জীবন (হায়াতান তাইয়্যিবাহ) দান করব এবং আমি অবশ্যই তাদের তাঁদের উত্তম কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব।"
–(সূরা আন-নাহল, ১৬: ৯৭)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের অধীনে 'হায়াতান তাইয়্যিবাহ' বা পবিত্র ও সুখী জীবনের এক নিখুঁত তাফসীর প্রদান করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র জীবনের অর্থ হলো- অন্তরের সন্তুষ্টি , মানসিক প্রশান্তি (সাকীনাহ), হালাল রিযিক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অপার্থিব স্বস্তি। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারীর পুরস্কারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ঘোষণা করেছেন।

পশ্চিমা নারী সব ধরণের বস্তুগত স্বাধীনতা পাওয়ার পরও কেন তীব্র ডিপ্রেশন, ট্রমা ও একাকীত্বের মহামারীতে ভোগে-তার মূল জবাব এই আয়াতে নিহিত। তারা আল্লাহর বন্দেগী ও হিজাবের পবিত্র বিধানকে ত্যাগ করে আত্মার চিরন্তন খোরাক থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে। পক্ষান্তরে, একজন মুমিন নারী অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে থাকলেও আল্লাহর বন্দেগীর কারণে তাঁর অন্তরে যে পরম সুকুন বা শান্তি বিরাজ করে, পৃথিবীর কোনো আধুনিক পুঁজিবাদী লাইফস্টাইল বা ফেমিনিস্ট দর্শন তা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

৪. বন্দেগীর মাধ্যমে সামাজিক ও আত্মিক শান্তির বাস্তব রূপ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার পবিত্র সমাজে নারী সাহাবীগণ (রা.) আল্লাহর বন্দেগীর দর্শনকে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা ও পরম সৌভাগ্য মনে করতেন।

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রা.)-এর ওপর আল্লাহর সালাম:

যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) আল্লাহর বন্দেগী ও রাসূলের সেবায় নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ

(সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদিজা আসছেন। তিনি যখন আপনার কাছে পৌঁছাবেন, তখন তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন। আর তাঁকে জান্নাতে মুক্তা দিয়ে তৈরি এমন এক প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে কোনো কোলাহল নেই এবং কোনো ক্লান্তি বা কষ্ট নেই।"
–(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা; হাদীস নং: ৩৮২০)।

ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী সাহাবীগণ তাঁদের প্রিয়তম স্বামী, পিতা বা ভাই শাহাদাত বরণ করার পরও চরম ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিতেন। তাঁরা কেবল একটি কথাই জিজ্ঞাসা করতেন, "আল্লাহর রাসুল (সা.) কি সুস্থ আছেন? তিনি যদি সুস্থ থাকেন, তবে আমাদের সমস্ত মুসিবত বা কষ্ট তুচ্ছ।"

এই ধরণের অলৌকিক মানসিক শক্তি ও সুখের অনুভূতি কেবল ওহীর আলোতে বন্দেগীর দর্শনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। ইসলাম অধিকারের নামে লিঙ্গীয় সংঘাত তৈরি করে সমাজকে নরক বানায় না; বরং বন্দেগীর মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মাঝে দায়িত্বের নিখুঁত ভারসাম্য এনে সমাজকে এক জান্নাতী প্রশান্তির নীড়ে পরিণত করে।

পাঠ ৬.৬: "ইসলামোফোবিয়া ও নারী অধিকার: মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা এনজিও-র রাজনৈতিক এজেন্ডা"

১. আধুনিক প্রেক্ষাপট: ইসলামোফোবিয়া এবং নারী অধিকারের অস্ত্রায়ন

একবিংশ শতাব্দীর ভূ-রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে 'ইসলামোফোবিয়া' বা ইসলামভীতি একটি সুনির্দিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারকগণ মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং আইনি স্বকীয়তা ধ্বংস করার জন্য 'নারী অধিকার'এবং 'লিঙ্গ সমতা' স্লোগানকে একটি ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

তাঁদের প্রধান প্রোপাগান্ডা হলো-মুসলিম নারীরা তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসন, হিজাব এবং ইসলামী পারিবারিক আইনের কারণে চরম 'নিপীড়িত' ও 'অবরুদ্ধ'। এই কৃত্রিম

আখ্যান তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী ইসলামের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করা এবং মুসলিম দেশগুলোর ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করা। পশ্চিমা বিশ্ব নিজেরা যখন পারিবারিক ধস, একাকীত্ব ও নারীর পণ্যকরণের মহামারীতে ভুগছে, তখন তারা নিজেদের এই পচনশীল সমাজব্যবস্থাকে 'আধুনিকতার একমাত্র মডেল' হিসেবে মুসলিম দেশগুলোর ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চায়, যাকে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীগণ 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা এনজিও-র ভূমিকা এবং রাজনৈতিক এজেন্ডা

উন্নত দেশগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও (NGOs) এবং মানবাধিকার সংগঠনসমূহ মুসলিম দেশগুলোর তৃণমূল স্তরে এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক চুক্তির (যেমন জাতিসংঘের সিডও বা CEDAW সনদ) মাধ্যমে এই এনজিওগুলো মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা এবং সমাজ কাঠামোতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে:

শারঈ পারিবারিক আইন বাতিলের চক্রান্ত: এই সংস্থাগুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো মুসলিম দেশগুলোর আদালত থেকে বিবাহ, তালাক, মিরাস বা উত্তরাধিকার এবং অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত শত শত বছরের ফিকহী আইনগুলো বাতিল করা। তারা গাণিতিক সমতার ছদ্মবেশে এমন আইন প্রবর্তন করতে চায় যা প্রকারান্তরে ইসলামী পরিবার প্রথাকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

হিজাব ও শালীনতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ: এনজিওগুলো বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা এবং মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মুসলিম তরুণীদের অবচেতনে এই বিষাক্ত ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চায় যে-হিজাব, হায়া এবং পারিবারিক অনুশাসন হলো আধুনিক ক্যারিয়ার ও নারী স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায়। তারা মুসলিম নারীদেরকে তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বকীয়তা ও আভিজাত্য থেকে বিচ্যুত করে পশ্চিমা ভোগবাদী লাইফস্টাইলের অনুসারী বানাতে চায়।

তৃণমূল স্তরে মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর: উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের নামে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম নারীদেরকে ক্ষুদ্রঋণ বা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদেরকে সনাতন পারিবারিক দায়িত্ব থেকে বিমুখ করে তোলা হচ্ছে। এর ফলে মুসলিম সমাজগুলোতেও এখন পারিবারিক কলহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং লিঙ্গীয় সংঘাত আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পশ্চিমা এজেন্ডারই সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন।

৩. ওহীর জ্ঞান এবং মুসলিম উম্মাহর আত্মরক্ষা: কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি

পশ্চিমা এই চতুর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ইসলামোফোবিক এজেন্ডার বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছে। আল্লাহ তাআলা ঈমানদার সমাজকে সতর্ক করে ইরশাদ করেন:

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم قل إن هذى الله هو الهدى

"আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের আদর্শ (জীবনব্যবস্থা) অনুসরণ করেন। আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েত বা ওহীর আলোই হলো একমাত্র প্রকৃত হেদায়েত।"
–(সূরা আল-বাকারাহ, ২:১২০)

অমুসলিম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলো মুসলমানদের দ্বীন, কৃষ্টি-কালচার ও পারিবারিক পবিত্রতা ধ্বংস করার চক্রান্ত থেকে কখনোই বিরত থাকবে না। তারা মুখে যতই নারী অধিকারের প্রলোভন দেখাক না কেন, তাদের মূল লক্ষ্য হলো মুসলমানদের ওহীর পথ থেকে বিচ্যুত করা।

ইসলামী শরীয়াহর পারিবারিক ও আইনগুলো কোনো মানুষের তৈরি সংকীর্ণ সমাজবিজ্ঞানের অংশ নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার চিরন্তন ও নিখুঁত ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের সুরক্ষার একমাত্র পথ হলো-পশ্চিমা এনজিওগুলোর চটকদার ফাঁদ চিনে ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা রক্ষা করা।

ইসলাম নারীকে যে 'মর্যাদা' ও আজীবন সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছে, তা কোনো পশ্চিমা আমদানি করা সেক্যুলার আইনের মুখাপেক্ষী নয়।

৪. সীরাতের স্বর্ণালী ইতিহাস: কাফিরদের প্রলোভন ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শিক আপসহীনতা

সীরাতে ইবনে হিশামের মহান ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদেরকে ওহীর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রলোভন বা অফার দিয়েছিল, যা আধুনিক এনজিও সংস্কৃতিরই প্রাচীন রূপ।

উতবাহ ইবনে রবীআহ-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব:
মক্কার কাফিররা যখন দেখল ইসলামের দাওয়াতের কারণে তাদের জাহেলী সমাজ কাঠামো নড়ে উঠছে, তখন তারা 'উতবাহ ইবনে রবীআহ'-কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পাঠাল। উতবাহ এসে প্রস্তাব দিল, "হে মুহাম্মদ! আপনি যদি এই দাওয়াতের মাধ্যমে আরবের নেতৃত্ব বা রাজত্ব চান, আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেব। আপনি যদি বিপুল ধন-সম্পদ চান, আমরা সবাই মিলে আপনাকে আরবের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বানিয়ে দেব। আর আপনি যদি আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী চান, আমরা তার সাথে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব; বিনিময়ে আপনি এই ওহীর দাওয়াত ছেড়ে দিন।"

আল্লাহর রাসূল (সা.) কাফিরদের এই বিশাল রাজনৈতিক ও জাগতিক প্রলোভনকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের প্রথম থেকে ৩৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে ওহীর আদর্শিক আপসহীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন।

ওহীর এই অমোঘ বাণী ও অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব শুনে উতবা এতটাই স্তম্ভিত ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর নিজের হালতের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়।(সীরাতে ইবনে হিশাম)

সীরাতের এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মুসলিম উম্মাহর পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ কখনো জাগতিক কোনো সুবিধা বা পশ্চিমা এনজিও-র দেওয়া ফান্ডের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। ইসলামোফোবিয়ার আড়ালে নারী অধিকারের এই ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডা মূলত মুসলিম নারীর মর্যাদা হরণ করার এক আন্তর্জাতিক কর্পোরেট চক্রান্ত। কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং সুন্নাহর আত্মরক্ষামূলক চেতনার মাঝেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত মুক্তি, স্বকীয়তা ও গৌরব।

||সপ্তম অধ্যায়|

“উপসংহার, প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা”

পাঠ ৭.১ “গবেষণার মূল নির্যাস ও প্রাপ্ত ফলাফল”

১. গবেষণার মূল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক নির্যাস

এই সুদীর্ঘ তুলনামূলক ও গবেষণাধর্মী থিসিসের আদি-অন্ত্য আলোচনার মূল নির্যাস হলো-সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কোনো কৃত্রিম গাণিতিক সমীকরণ বা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বিষয় নয়; বরং তা মানবীয় প্রকৃতি (ফিতরাত) ও আল্লাহর আইনের এক সুসংগত মিলবন্ধন। আধুনিক সেক্যুলার বিশ্ব এবং উগ্র নারীবাদী আন্দোলন মূলত মানুষকে এক বিভ্রমাত্মক ও যান্ত্রিক স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। যেখানে পরিবার প্রথাকে নারীর জন্য একটি শৃঙ্খল এবং মাতৃত্বের পবিত্র দায়িত্বকে একটি অবমাননাকর 'জৈবিক দাসত্ব' হিসেবে অপপ্রচার করা হয়েছে।
এর বিপরীতে, ইসলামী শরীয়াহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা চিরকালের শত্রু হিসেবে দেখার শোষিত মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম এই দুই মানবিক সত্তাকে পরস্পরের সহযোগী, আত্মার আত্মীয় এবং পারস্পরিক পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করে।

নারীবাদ যেখানে কেবল শুষ্ক, বস্তুবাদী ও রাজনৈতিক 'অধিকার'-এর বুলি আওড়ে নারীকে ঘরের বাইরে এনে কর্পোরেট বিশ্বের দ্বিমুখশোষণের শিকার করেছে, ইসলাম সেখানে নারীকে তাঁর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মর্যাদার পূর্ণ আইনি স্বীকৃতি দিয়ে এক অবিনশ্বর ঐশী 'মর্যাদা'র রাজকীয় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য এটাই প্রমাণ করে যে, নারীবাদের তথাকথিত মুক্তির শেষ সীমানা যেখানে একাকীত্ব ও সামাজিক পতন, ইসলামের বন্দেগীর দর্শনের শুরু সেখানেই পরম আত্মিক প্রশান্তি ও পারিবারিক সুরক্ষার নিশ্চিন্ত নীড়।

২. গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌলিক বৈজ্ঞানিক ফলাফলসমূহ

দীর্ঘ এই সমাজতাত্ত্বিক ও ফিকহী পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য ফলাফলগুলো এই থিসিসে প্রমাণিত হয়েছে:

পশ্চিমা পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর ধস:
পাশ্চাত্য নারীবাদের অন্ধ অনুকরণের চূড়ান্ত পরিণতি হলো ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। বিবাহবিচ্ছেদের জ্যামিতিক হার, বিয়েহীন লিভ-ইন কালচার, 'সিঙ্গল মাদারহুড' বা একক মাতৃত্বের করাল গ্রাস, 'ব্রোকেন হোম' বা ভাঙা পরিবারের মাঝে বড় হওয়া পরবর্তী প্রজন্মের মানসিক বিকারগ্রস্ততা এবং বার্ধক্যে চরম অবহেলা ও 'ওল্ড হোম' বা বৃদ্ধাশ্রমের অমানবিক নিঃসঙ্গতা-পাশ্চাত্যের তথাকথিত নারী স্বাধীনতার এক নির্মম ও বাস্তব কুফল।

পুঁজিবাদ কর্তৃক নারীর পণ্যকরণ ও শ্রম শোষণ:
নারীবাদ নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে এনেছে ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও জাতিসংঘের ডাটা অনুযায়ী, কার্যত তাকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মুনাফা বাড়ানোর স্বার্থে সস্তা শ্রমিকে রূপান্তর করা হয়েছে। একই সাথে মিডিয়া ও বিনোদন জগতে নারীর শরীরকে 'কমোডিফিকেশন' বা বাণিজ্যিক পণ্যের কাটতি বাড়ানোর সস্তা হাতিয়ার করা হয়েছে, যা নারীর প্রকৃত মানবিক সত্তাকে ধূলিসাৎ করেছে।

বৈশ্বিক জনসংখ্যাগত মহাবিপর্যয়:
ক্যারিয়ারের অন্ধ মোহে পড়ে মাতৃত্বের অবমূল্যায়নের ফলে বর্তমান উন্নত বিশ্ব (যেমন ইউরোপ, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া) এক ভয়ানক প্রজনন হার হ্রাসের সংকটে পড়েছে, যা পুরো মানব সভ্যতাকে এক স্থায়ী বিলুপ্তি ও জনশূন্যতার 'ডেমোগ্রাফিক টাইম বোম্ব'-এর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

ইসলামী আইনের নিখুঁত দায়িত্বভিত্তিক ভারসাম্য:
ইসলামী ফিকহে নিকাহ,পরিবার,হিজাব- নিকাব, মিরাস (উত্তরাধিকার), সাক্ষী এবং ভরণপোষণ-এর সুনির্দিষ্ট আইনগুলো কোনো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নয়। বরং তা দায়িত্ব ও সুরক্ষার ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত এক অনন্য ইনসাফ । ইসলাম পুরুষকে পরিবারের সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যয়ের বাধ্যতামূলক করে দিয়ে নারীকে তার প্রাপ্ত সম্পদ সম্পূর্ণ নিজের কাছে জমানোর নিরঙ্কুশ আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও আজীবন সামাজিক সুরক্ষার রাজকীয় গ্যারান্টি প্রদান করেছে।

পাঠ- ৭.২ : "বর্তমান নারীবাদ সংকটে ইসলাম একমাত্র সমাধান"

১. আধুনিক নারীবাদের দার্শনিক সংকট ও বৈশ্বিক মহাবিপর্যয়

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং উগ্র নারীবাদী আন্দোলন বিগত এক শতাব্দী ধরে বিশ্বজুড়ে নারীর তথাকথিত অধিকার, মুক্তি এবং 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' এর যে চটকদার বয়ান বা আখ্যান প্রচার করে এসেছে, একবিংশ শতাব্দীতে এসে তা এক চরম মানবিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটে পতিত হয়েছে। নারীবাদ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি (ফিতরাত) এবং জীববৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের বন্ধু বা জীবনসঙ্গী ভাবার পরিবর্তে চিরস্থায়ী 'প্রতিপক্ষ' বা শত্রু হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারা বিবাহ ব্যবস্থাকে শৃঙ্খল এবং মাতৃত্বের পবিত্র দায়িত্বকে 'জৈবিক দাসত্ব' বলে অবমূল্যায়ন করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সাম্প্রতিক ডাটা ও পরিসংখ্যান এই পচনশীল দর্শনের এক নির্মম বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছে। নারীবাদ নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে এনে পুঁজিবাদী কর্পোরেট বিশ্বের সস্তা শ্রমিকে পরিণত করেছে এবং মিডিয়া জগতে তার শরীরকে 'কমোডিফিকেশন' বা বাণিজ্যিক পণ্যের কাটতি বাড়ানোর সস্তা হাতিয়ারে রূপান্তর করেছে। এর সরাসরি কুফল হিসেবে পশ্চিমা সমাজ আজ বিবাহবিচ্ছেদের মহামারী, লিভ-ইন পার্টনারদের চরম নিরাপত্তাহীনতা, 'সিঙ্গল মাদারহুড' বা একক মাতৃত্বের অভিশাপ, 'ব্রোকেন হোম' বা ভাঙা পরিবারের মানসিক ট্রমা এবং বার্ধক্যে বৃদ্ধাশ্রম বা

ওল্ড হোমের নিষ্ঠুর একাকীত্বে ভুগছে। ক্যারিয়ারের অন্ধ মোহে পড়ে সন্তান না নেওয়ার এই আত্মঘাতী সংস্কৃতির ফলে আজ পুরো পশ্চিমা বিশ্ব ডেমোগ্রাফিক কোলাপ্স বা প্রজনন হার হ্রাসের এক স্থায়ী সভ্যতার বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই সামগ্রিক সামাজিক নরকযন্ত্রণা ও নৈতিক অবক্ষয় প্রমাণ করে যে, মানুষের তৈরি ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদী দর্শন নারীকে মুক্তি দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

২. ইসলামের শাশ্বত বন্দেগীর দর্শন ও প্রাকৃতিক দায়িত্ব বিভাজন

পাশ্চাত্যের এই গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মহামারীর একমাত্র স্থায়ী, প্রাকৃতিক এবং বাস্তবসম্মত সমাধান পেশ করে ওহীর আলো এবং ইসলামী শরীয়াহর সামগ্রিক নিখুঁত জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ঘোষণা করে যে, মানুষ জন্মগতভাবেই সৃষ্টি এবং সে সম্পূর্ণ আইনহীন বা স্বাধীন হতে পারে না; সে আল্লাহর আইন না মানলে অবধারিতভাবে নিজের কুপ্রবৃত্তি, সমাজ, রাষ্ট্র বা কোনো পুঁজিপতির দাসত্বে লিপ্ত হবে। অতএব, প্রকৃত মুক্তি কোনো অনিয়ন্ত্রিত পোশাক বা সামাজিক আইনহীনতার মাঝে নেই; বরং প্রকৃত মুক্তি নিহিত রয়েছে সমস্ত জাগতিক ক্ষমতার শৃঙ্খলকে অস্বীকার করে একমাত্র মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টার 'বন্দেগী' বা দাসত্ব স্বীকার করার মাঝে।

ইসলাম সমাজকে কেবল শুষ্ক গাণিতিক সমতার দাঁড়িপাল্লায় মাপে না; বরং এটি দায়িত্ব ও সুরক্ষার ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে এক অনন্য 'ঐশী ইনসাফ'ও শান্তির সমাজ কায়েম করে। ইসলাম প্রকৃতিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজে এক নিখুঁত 'প্রাকৃতিক দায়িত্ব বিভাজন' প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম পুরুষকে পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষাকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব বাধ্যতামূলক করে এবং নারীকে ঘরের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, পারিবারিক প্রশান্তি ও নতুন আদর্শ প্রজন্ম গড়ার কারিগর হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়। এই বণ্টন ব্যবস্থায় কোনো পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ক্ষোভ থাকে না, বরং সমাজে এক জান্নাতী সুকুন বা ঐশী প্রশান্তি বিরাজ করে, যা পবিত্র কুরআনের সূরা আর-রুমের ২১ নম্বর আয়াতে 'সুকুন' (মানসিক শান্তি) ও 'রাহমাহ' (পারস্পরিক দয়া) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. ইসলামী আইনি কাঠামোর অভেদ্য সুরক্ষাকবচ

ইসলামী ফিকহে হিজাব, মিরাস (উত্তরাধিকার), সাক্ষী এবং নফকা (ভরণপোষণ)-এর সুনির্দিষ্ট আইনগুলো কোনো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নয়, বরং তা নারীর দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিশ্চিত করার অভেদ্য সুরক্ষাপ্রাচীর।

অর্থনৈতিক মুক্তি :

ইসলামী পারিবারিক আইনে পুরুষকে তার নিজের, স্ত্রীর, সন্তানদের এবং পরিবারের সমস্ত অভাবী নারীর ভরণপোষণ (নফকা) দিতে আইনি ও ধর্মীয়ভাবে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে, একজন নারী উত্তরাধিকার (মিরাস), মহরানা বা ব্যবসার সূত্রে যা পান, তা সম্পূর্ণ তার একক নিরঙ্কুশ মালিকানায় থাকে। তিনি চাইলে তা নিজের ইচ্ছামতো সম্পূর্ণ সঞ্চয় করতে পারেন, স্বামী বা পিতা সেখানে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এটি নারীকে জীবিকার নিষ্ঠুর যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে, যা পুজিবাদী দ্বিমুখী শোষণ থেকে নারীকে প্রকৃত মুক্তি দেয়।

হিজাব ও হায়ার মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর:

ইসলাম কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক পরিমণ্ডলে নারীর হিজাব ও শালীনতার বিধান দিয়ে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিকে নারীর শরীর থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে তার বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও মেধার ওপর ফোকাস করতে বাধ্য করে। হিজাব পরিধান করে একজন নারী পুরুষতান্ত্রিক লোলুপতাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষার বৃহত্তর ময়দানে নিজের অবদান রাখতে পারেন।

পারিবারিক ও বার্ধক্যের রাজকীয় মর্যাদা:

ইসলাম বিয়েকে সহজ করার এবং তালাককে চূড়ান্ত ও অপ্রিয় শেষ সমাধান হিসেবে কঠোর আইনি কাঠামোর ভেতরে রাখার তাগিদ দেয়। ইসলামে একজন নারী কন্যা হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ, স্ত্রী হিসেবে অর্ধাঙ্গিনী এবং মা হিসেবে তাঁর দুই পায়ের নিচে জান্নাত স্থাপন করে তাকে সমাজের সর্বোচ্চ ও পবিত্রতম আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় 'ওল্ড হোম' বা বৃদ্ধাশ্রমের কোনো স্থান নেই, কারণ বৃদ্ধ বয়সে মাকে উফ! বলাও আল্লাহ তাআলা বড় গুণাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতো বিদুষী নারীগণ হিজাব ও পর্দার ভেতরে থেকেই সমাজকে অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কোনো কৃত্রিম নারীবাদী আন্দোলনের সাহায্য ছাড়াই। অতএব, বর্তমান বৈশ্বিক নারীবাদ সংকটে ইসলামই একমাত্র শাশ্বত ও চূড়ান্ত সমাধান। ইসলাম অধিকারের নামে সংঘাত তৈরি করে সমাজকে ধ্বংস করে না; বরং মর্যাদার ভিত্তিতে এক নিখুঁত ইনসাফ ও শান্তির সমাজ কায়েম করে মুসলিম নারীর প্রকৃত আভিজাত্য, স্বকীয়তা ও গৌরব আজীবন সুরক্ষিত রাখে।

পাঠ ৭.৩: "সুপারিশ: মুসলিম সমাজ, রাষ্ট্র এবং নারী সমাজকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা"

১. সমাজ, রাষ্ট্র এবং মুসলিম নারী সমাজের করণীয়

এই গবেষণার চূড়ান্ত পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে মুসলিম উম্মাহ, সমাজ চিন্তক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং স্বয়ং নারী সমাজের সুরক্ষার্থে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা পেশ করা হলো:

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ওহীর জ্ঞানের সমন্বয়: মুসলিম দেশগুলোর জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম থেকে পশ্চিমা সেক্যুলার ও নারীবাদী বিষাক্ত তত্ত্বগুলো বর্জন করতে হবে। এর পরিবর্তে প্রাথমিক স্তর থেকেই কুরআন, হাদীস ও সীরাতের আলোতে নারী ও পুরুষের পরিপূরকতা, হায়া, লজ্জাশীলতা এবং পারিবারিক মূল্যবোধের মহান পাঠ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আইনি ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাকবচ: মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে পশ্চিমা এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সিডও (CEDAW) সনদের অনৈতিক ও সমাজবিধ্বংসী শর্তাবলীর চাপ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। দেশের আদালতগুলোতে ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী হিজাবের নিরাপত্তা, মোহরানার দ্রুত আদায়, নফকা বা ভরণপোষণের কঠোর বাস্তবায়ন এবং মিরাস বা উত্তরাধিকার আইনের সঠিক বণ্টন রাষ্ট্রীয় পাহারায় নিশ্চিত করতে হবে, যেন কোনো নারী আইনি বঞ্চনার শিকার না হন।

গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ: বিনোদন ও গণমাধ্যমে নারীর পণ্যকরণ, অশ্লীল প্রদর্শনীবাদ এবং ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মিডিয়াতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এবং নারী সাহাবীগণের ইলমী ও সামাজিক খিদমতের সোনালী ইতিহাস ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে, যেন মুসলিম তরুণীরা হিজাবের ভেতরে থেকেই আত্মমর্যাদাশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়।

মুসলিম নারী সমাজের প্রতি আহ্বান: মুসলিম নারীদেরকে পশ্চিমা চটকদার ও শোষিত 'অধিকার'-এর মরীচিকার পেছনে ছোটা বন্ধ করতে হবে। তাঁদের বুঝতে হবে যে, ইসলাম তাঁদেরকে যে রাজকীয় 'মর্যাদা' ও জান্নাতী সম্মান দিয়েছে, ওহীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাঝেই রয়েছে তাঁদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন চূড়ান্ত মুক্তি।

২. মুসলিম উম্মাহর জন্য শিক্ষা

খিলাফতে রাশেদা দের জীবনী এবং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলিম সমাজ যখনই আল্লাহর ওহীর বিধান (শরীয়াহ আইন) ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, তখনই সমাজ থেকে সমস্ত পাপাচার ও লিঙ্গীয় সংঘাত দূর হয়ে এক অভূতপূর্ব শান্তি কায়েম হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মাহর সুপারিশ হিসেবে নারীদের সুরক্ষার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা আমাদের রাষ্ট্রীয় পলিসির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত: "আমি তোমাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার অকাট্য অসিয়ত করছি।"
–(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ; হাদীস নং: ১২১৮)।
রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর দ্বীন কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর হারিয়ে যাওয়া গৌরব ও পারিবারিক শান্তি ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ।

“সমাপ্ত”